জানুয়ারি-ডিসেম্বর 2001

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা প্রকাশিত সমাজ ও বিজ্ঞান-বিষয়ক পত্রিকা

ত্রয়োবিংশ বর্ষ | প্রথম-চতুর্থ সংখ্যা | দাম পনের টাকা

যুদ্ধ ব্যবসা

পরিবেশ ও যুদ্ধ

টালি নালা

মনোচিকিৎসার 'বিপদ'

নাগা মুক্তি আন্দোলন

■ ■ ■ ■

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

বর্ষ 23 সংখ্যা 1-4

জানুয়ারি-ডিসেম্বর 2001

সূচিপত্র

আমাদের কথা ... 1

যুদ্ধ ব্যবসা ... 2

বিষয় : পরিবেশ

পরিবেশ আইন-কানুন ... 7

টালি নালা এবং 'ওরা' ও 'আমরা' ... 14

'মানসিক অসুস্থতা' কিংবদন্তী ও অমানবিক 'মনোচিকিৎসা' ... 18

নিউরোলেপটিক ড্রাগ কি নিষিদ্ধ হওয়া উচিত... 33

ল্যালা—একটি বাতিল ছেলের কথা ... 39

পরিক্রমা :

নাগা মুক্তি আন্দোলন কি নতুন পথে?...40

সুখময় ভট্টাচার্য স্মরণে ... 43

সত্যকে মনে রেখে ... 44

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

প্রযত্নে : অভিজিৎ লাহিড়ী

P 252, লেকটাউন, ব্লক A

কলকাতা 700 089

আমাদের কথা

বিওবি ছোট পত্রিকা। তাই বলে এর পূজো সংখ্যা, দোল সংখ্যা, গ্রীষ্ম, বর্ষা, ইদ বা বড়দিন সংখ্যা ইত্যাদি প্রকাশ হতেও কোন বাধা ছিল না। বরঞ্চ 'ছোট'রা তাদের ছোটত্ব কাটিয়ে ওঠার প্রয়াস পায় এইসব বিশেষ সংখ্যার মাধ্যমে, বিওবি কোনদিনই সে রাস্তায় হাঁটেনি, হাঁটেনা, এর গ্রাহক পাঠকরা তা জানেন, এবং মেনেও নিয়েছেন। কিন্তু তাই বলে গত এক বছর বিওবি তার নিয়মিত সংখ্যাগুলিও বের করতে পারবে না এমনটা হওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু হয়েছে। গত বছর বইমেলার পর আবার আমরা এই সংখ্যাটি প্রকাশ করছি এবছরের বইমেলার সময়। এ নিয়ে নতুন করে বলার তেমন কিছুই নেই 'বিওবি'র গ্রাহক পাঠকরা সকলে জানেন বোঝেন যে সময় বড় কঠিন। বড় ও বাণিজ্যিক পত্র পত্রিকাও হিমসিম খাচ্ছে, ছোট ও অবাণিজ্যিক পত্রিকার সময় তো খারাপ যাবেই। তবে বলে নিই, আপাতত আমাদের প্রধান সমস্যা উপযুক্ত লেখাপত্র না পাওয়া। সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে আবেদন রইল মতামত লেখাপত্র পাঠানোর। যতদিন, যখন যেমন সেসব পাওয়া যাবে অনিয়মিত হলেও বিওবি বেরোবে-আপাতত এটুকু বলতে পারি।

2001 একটি ঘটনাবহুল বছর। বোধহয় নতুন নানা তাৎপর্যের ইঙ্গিতবাহী। 11 ই সেপ্টেম্বর এবং তার পরবর্তী ঘটনাবলী—যার বিশেষ কেন্দ্র এশিয়ার বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চল—বিষম উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সন্ত্রাস ও যুদ্ধের এক নতুন বাতাবরণ, এক নতুন সংঘর্ষপূর্ণ পৃথিবী শেষ পর্যন্ত কোন দিকে যাবে? যে ঘটনাবলীর বিবরণ এতদিন টিভির পর্দায় দেখে আমরা সচকিত হচ্ছিলাম সেই ঘটনা এখন আমাদের দেশের মাটিতেই ঘটার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ভারত ও পাকিস্তান সরকারের প্রধানেরা পরস্পরের প্রতি যেভাবে হুংকার ছেড়ে চলেছে তাতে আমরা আতঙ্কিত। এই সংখ্যাতেও কয়েকটি লেখার মধ্য দিয়ে আমরা খুঁজতে চেয়েছি বর্তমান সন্ত্রাস ও যুদ্ধোন্মাদনার প্রেক্ষাপট। যুদ্ধাস্ত্রের বাণিজ্য প্রসারের পুরনো তত্ত্বও যেমন এ আলোচনার মধ্যে এসেছে ('যুদ্ধ ব্যবসা') তেমনি দুই বিপরীতমুখী বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার দ্বন্দ্বের এক নতুন তত্ত্বও এতে আলোচিত ('বিষয় পরিবেশ')। উন্নয়ন ও উচ্ছেদ বহু আলোচিত একটি বিষয়, তবুও ঘরের কাছের এই প্রক্রিয়া হয়তো আমাদের নতুন করে ভাববার। টালি নালাকে কেন্দ্র করে বয়ে চলেছে যে উদ্ধত উদ্যম ও উচ্ছিন্ন জীবন, তা নিয়ে ভাবার অবকাশ না থাকলে আমাদের মতো ছোট পত্রিকাগুলি প্রকাশের প্রয়োজনও ফুরিয়ে যায়।...... এসবের পাশাপাশি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যাও এবারের সংখ্যাতে তুলে ধরা হচ্ছে-মনোরোগ তথা মানসিক অসুস্থতায় চিকিৎসা-প্রার্থীদের সমস্যা। একদিকে সচেতনতার, সহমর্মিতার একান্ত ঘাটতি। আর অন্যদিকে পেশাদারদের একাংশের একপেশে পেশীপ্রদর্শন, কিভাবে এই অসহায় চিকিৎসা প্রার্থীদের জীবনে অভিশাপ ঘনিয়ে তোলে তার আলোচনা সাধারণত এড়িয়ে যাওয়া হয়। আমরা প্রকাশ করছি এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার আশা নিয়ে।

2001-এ আমরা হারিয়েছি আমাদের দুই ঘনিষ্ঠকে। একজন সত্য আমাদের সবার প্রিয়, বিওবি'র অন্যতম কর্মী, সত্যব্রত কর। গণবিজ্ঞান আন্দোলনে অক্লান্ত উৎসাহী, আমাদের সহযাত্রী এবং সম্ভবত একজন অন্যতম অগ্রণী সত্য অকালে চলে গেল। শেষ কয়েকবছর খুব সুস্থভাবেও সত্যর জীবন কাটেনি। তবুও সে ছিল অনেকের মধ্যে অনেক ক্রিয়ার সাথী' প্রেরণা। ওর মৃত্যু নাড়া দিয়েছে একদল তরুণকে এবং তারা অবিশ্বাস্য দ্রুততায় সত্য'র পুরনো লেখাপত্র সংগ্রহ করে, কিছু স্মৃতিচারণমূলক লেখা জুড়ে একটি সংকলন প্রকাশ করেছে ('স্মৃতি—সত্যব্রতর নানা লেখা')। সত্যর স্মৃতিসভায় যাঁরা উপস্থিত থাকতে পেরেছিলেন তাঁরা তো সেই স্মারকগ্রন্থটি পেয়েছেনই, তাছাড়াও আমরা বিওবি'র নিয়মিত পাঠকদেরও বইটি উপহার দিয়েছি। যাঁরা এখনও পাননি, বইমেলায় সংগ্রহ করতে পারেন।

দ্বিতীয় যে বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীর মৃত্যু আমরা গভীরভাবে স্মরণ করি তিনি ডাঃ সুখময় ভট্টাচার্য, আমাদের প্রিয় সুখময়দা। সত্যর চেয়ে বয়সে কিছুটা বড় হলেও, তাঁরও অকাল মৃত্যুই ঘটেছে। শেষ জীবনে তিনিও পেয়েছেন অশেষ কষ্ট ও যন্ত্রণা। জনস্বাস্থ্য নিয়ে নতুন পথের সন্ধান করেছেন আজীবন, পেশাগতভাবে চিকিৎসকদের নৈতিকতা ও দায়বদ্ধতার কথা বলেছেন সারাজীবন, হয়তো সেসব একেবারেই বৃথা যাবার নয়।

যুদ্ধ ব্যবসা

শুভব্রত নিয়োগী

যুদ্ধ মানেই নিরপরাধ মানুষের মৃত্যু, আতঙ্কিত মানুষের ভিটে মাটি ছেড়ে পালানো, অপরিসীম সম্পদ নষ্ট আর পরিবেশের ক্ষতি। যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তিকামী মানুষ পথে নামে, "অল কোয়ায়েট অন দিন ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট" এর মত মর্মস্পর্শী উপন্যাস পৃথিবীর মানুষকে ছুঁয়ে যায়, তবুও যুদ্ধ হয়। কারণ যুদ্ধ কারো কারো কাছে অত্যন্ত দরকারী। যেন তেন প্রকারেণ যুদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টি করা তাদের চাইই। এখানে তাদের কথাই বলছি যাদের যুদ্ধ মানেই লাভ, শান্তি মানেই অস্তিত্বের সংকট। যুদ্ধ হলো—এটাই বড় কথা। শেষ পর্যন্ত ফল কি দাঁড়ালো সেদিকে তাদের খুব আগ্রহ থাকে না। তাছাড়া আজকাল যুদ্ধ শেষে কাউকে ঠিক নির্দিষ্ট ভাবে জয়ী বলে ভিকট্রি স্ট্যান্ডে দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায় না। যেমন উপসাগরীয় যুদ্ধে আমেরিকা জয়ী আবার সাদ্দাম হুসেন অতঃপর স্বগৌরবে ইরাকে শাসন কার্য চালিয়ে যাচ্ছে। ধরা যাক যে একটি লোক কে ধরার জন্য (বাহ্যতঃ) আমেরিকা—ব্রিটেন আফগানিস্তানে বোমার দুরমুশ চালাচ্ছে, সেই লাদেন হঠাৎ হার্ট ফেল করে বা ম্যালেরিয়ায় মারা গেলো অথবা তার আর খোঁজ পাওয়া গেলো না তবে কি বলবেন এই রাজকীয় যুদ্ধ বাজি ব্যর্থ হলো? কোনও দামই রইল না এই কোটি কোটি ডলারের? হাতে পড়ে থাকলো ওপিয়াম গুল্মের পোড়া ছাই?

না। যুদ্ধ যাদের দরকার ছিল—তারা যথেষ্টই সফল। শত্রুরের মুখে ছাই দিয়ে তারা ঘরে তুলছে সম্পদ। লাদেন মারা পড়লে ভালো, না মরলেও বা কি! এর মধ্যে ফাউ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে একমেবদ্বিতীয়ম আমেরিকান পেশীর দম্ভ। বিশ্ব বাজার দখলের লড়াইয়ে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাম্প্রতিক হম্বি তম্বি ঠাণ্ডা। তেল দুনিয়ার সাদ্দাম-গদ্দাফি-চুপ। জাপান হাত (যুদ্ধ বিমান) বাড়িয়ে দিয়েছে। রাশিয়া সরাসরি মাটি ছেড়ে দিয়ে বসে আছে। শান্তি আন্দোলন, পরিবেশ নিয়ে কথাবার্তা আপাতত শীত ঘুমে। সিয়াটেল থেকে সিডনির দুঃস্বপ্নের অবসান। শান্তি, শান্তি, শান্তি।

সে লীলা বুঝবি খ্যাপা কেমন করে

সত্যিই বোঝা দুস্কর। তবুও আমরা এবার একটু দেখতে চাইবো যুদ্ধের লাভের কড়ি কাদের পকেটে যাচ্ছে। যুদ্ধের নানা কারণ থাকতে পারে—সে সবের কোনও বিশ্লেষণে যাবার অবকাশ এখানে থাকছে না। সোজ সাপটা ভাবে "লোক মেরে টাকা কামানোর" অর্থনীতির দিকে একটু দেখার চেষ্টা হচ্ছে।

যুদ্ধ থেকে সরাসরি লাভ হয় যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণকারীদের। অতএব ব্যবসার স্বার্থেই তারা যদি যুদ্ধ চায় তবে তাদের খুব দোষ দেওয়া যায় না। এই ব্যবসায় যে সব সময় যুদ্ধই চালাতে হবে তা নয়—যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি করতে পারলেও বেশ বিক্রি বাটা হয়—যেমন ভারত পাকিস্তান বছর বছর যুদ্ধাস্ত্র কেনে পাল্লা দিয়ে। যুদ্ধাস্ত্র নির্মাতারা তো আর নিজেরা যুদ্ধ বাধাতে পারে না তাই দরকার হয় রাষ্ট্রের—রাজনীতির এবং এমন কোনও 'বড় দাদা' রাষ্ট্রের যে বা যারা বিশ্বের ওপর খবরদারি করতে পারে অনায়াসে। "দাদা" রাষ্ট্র কোম্পানিদের পাইয়ে দেয় বাজার আর কোম্পানি গুলো দেখে তার অর্থনীতির শরীর স্বাস্থ্য—মোটামুটি যুদ্ধ নামক ব্যবসাটির এই হলো গোদা চাবিকাঠি।

এবার একটু হিসেব নিকেশ। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের কথা এখন থাক। শুরু করি উপসাগরীয় যুদ্ধ দিয়ে। যে যুদ্ধের দৌলতে অস্ত্র কেনার হিড়িক পড়ে গিয়েছিলো অর্ধেক পৃথিবী জুড়ে। যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণকারী কোম্পানি গুলোর, তাদের দেশের সরকার, দালাল আর মাফিয়াদের বড় সুখের সময় ছিল সে কটি বছর।

এরোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশণের সরকারি রিপোর্টেই দেখা যাচ্ছে যে যুদ্ধ বিমান আর এরোস্পেস সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি রপ্তানি 1995 এ 31% বেড়ে যায়। দু বছরের কম সময়ের মধ্যেই আমেরিকা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বেচতে পারে 500 টি কমব্যাট জেট; F–15, F–16, F/A–18 ইত্যাদি। তবে মূল ক্রেতারা সকলেই পশ্চিম এশিয়ার তেল রপ্তানিকারক দেশগুলো। ব্যালেন্স অফ পেমেন্টের অছিলায় বিনে পয়সায় তেল নেবার বিনিময়ে আমেরিকা গছালো যুদ্ধাস্ত্রের সম্ভার। ডবল লাভ। কুয়েত বার্ষিক GDP-র মাত্রা অতিক্রম করে অস্ত্র কিনলো। সৌদি আরব 1995-1997 এর মধ্যে 31.3 বিলিয়ন ডলারের

যুদ্ধ সরঞ্জাম কিনলো। সংযুক্ত আবর আমীরশাহী যেহেতু উপসাগরীয় যুদ্ধের পরোক্ষ উপভোক্তা তাই দাদার আবদারে (আমেরিকার ডেপুটি সেক্রেটারি অব ডিফেন্স—মিঃ জন হোয়াইটের "অনুরোধে") তাকেও কিনতে হলো 80টি আমেরিকান যুদ্ধ বিমাণ ও 4 টি রনতরী, এদিকে তাইওয়ান কিনে নিলো 150 টি F–16। উপসাগরীয় যুদ্ধে মোট খরচা হয়েছিলো 80 বিলিয়ন ডলার (জনগণের টাকা)। তার কতগুণ কতগুণ অর্থ কোম্পানি গুলো ঘরে তুললো! —কথায় আছে ফেল কড়ি (যুদ্ধ) মাখো তেল (ডলার)।

ওসামাকে মারার খরচ বাড়লে লাভ লাদেন পরিবারের

ওয়াশিংটন থেকে প্রকাশিত এক খবরের সূত্রে জানা যায় যে ওসামা বিন লাদেনকে ধরার জন্য আমেরিকার প্রতিরক্ষা ব্যয় বাড়লে সরাসরি লাভবান হতে পার লাদেনের পরিবার।

ওয়াশিংটনের বিখ্যাত ব্যাঙ্ক'র কারলাইল গোষ্ঠীর তহবিলে সৌদি আরবের লাদেন শিল্পগোষ্ঠী নিয়মিত লগ্নি করে থাকে। কারলাইল গোষ্ঠী আবার বিমান নির্মাণ এবং প্রতিরক্ষাসংক্রান্ত বেশ কয়েকটি সংস্থার বেচা-কেনার সঙ্গে জড়িত। কারলাইল গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ এবং সৌদি রাজপরিবারের সঙ্গে আত্মীয়তার সুবাদে বিন লাদেন পরিবারের সঙ্গে মার্কিন রিপাবলিকান দলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বলে জানিয়েছে ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল।

পত্রিকাটির দাবি, গত কয়েক বছরে সৌদি আরবের জেড্ডায় বিন লাদেন পরিবারের সদর দপ্তরে আতিথেয়তা গ্রহণ করেছেন বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্টের পিতা প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জর্জ এইচ ডব্লু বুশ সহ রিপাবলিকান দলের বেশ কয়েকজন হোমরা চোমরা নেতা। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বুশ-কারলাইল গোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাব যুক্ত, তিনি গোষ্ঠীর এশীয় সহযোগীদের উপদেষ্টাও। প্রাক্তন বিদেশসচিব জেমস বেকার এবং প্রাক্তন প্রতিরক্ষা সচিব ফ্র্যাঙ্ক কারলুসি গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান। প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারাও গত বছর আটলান্টার কার্টার সেন্টারে এক তহবিলের জন্য অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে ওসামার দশ জন ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করেন।

ওসামা বিন লাদেনের পিতা শিল্পপতি মহম্মদ বিন লাদেনের চেষ্টাতেই মূলত গড়ে ওঠে পাঁচশো কোটি ডলারের এই সৌদি শিল্প সাম্রাজ্য।...........

বিন লাদেন পরিবারের সঙ্গে আমেরিকার সুসম্পর্ক নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ কম। 1996 সাল সৌদি আরবের দায়হানে ট্রাক বোমায় মারা যায় 19 জন আমেরিকান সেনা। তার পর মার্কিন বাহিনীর ব্যারাক ও বিমানবন্দর পুনর্নির্মানের বরাত পায় বিন লাদেন শিল্প গোষ্ঠীই।................

(সূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, 29 সেপ্টেম্বর, 2001)

যুদ্ধ শেষ মানেই কি ব্যবসা শেষ। নেভার। যুদ্ধের আবর্জনা—না ফাটা বোমা, মাইন বৈজ্ঞানিকভাবে পরিষ্কার করা যার তার কম্ম নয়। এ ক্ষেত্রেও রাখেন সে হরি—যিনি মেরেছেন। CMC কোম্পানি যাদের বানানো মাইন পোঁতা হয়েছিলো—তারা পেলো কুয়েতে মাইন তোলার কাজ—বর্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় 'সাফাইওয়ালা' এই আমেরিকান কোম্পানিটির বার্ষিক লাভের পরিমাণ 160 মিলিয়ন ডলার। 1991 সালে ব্রিটিশ কোম্পানি "রয়াল অর্ডিনান্স" কুয়েত থেকে 90 মিলিয়ন ডলারের বরাত পায়। কাজ ছিলো ঐ—না ফাটা মাইন তোলা। যে গুলোর মধ্যে তাদের বানানো "L–90 বার" মাইন গুলোই ছিলো অন্যতম।

শিকারের চেয়ে শিকারী (সাদ্দাম হোসেন) ভাল

আমেরিকা যে অত্যাচারপ্রবণ, কর্তৃত্ববাদী ও কঠোর নানা জমানাকে মদৎ যুগিয়ে এসেছে ও গণতান্ত্রিক উদ্যোগের পথ রুদ্ধ করেছে এটা জানাই আছে।

একটা খুব চমকপ্রদ উদাহরণ নেওয়া যাক। উপসাগরীয় যুদ্ধের ঠিক পরে পরেই, 1991 সালের মার্চ মাসে, যখন ইরাকের আকাশ পুরোপুরি মার্কিনীদের কব্জায়, ইরাকের দক্ষিণ অংশে এক বিদ্রোহ দেখা দেয়। এতে ইরাকের কয়েকজন ফৌজী সেনাপতি জড়িত ছিল। এরা সাদ্দাম হোসেনকে উৎখাৎ করতে চেয়েছিল। তারা আমেরিকার সমর্থন চায় নি শুধু যেসব ইরাকী অস্ত্রপাতি মার্কিনী দখলে ছিল সেগুলো ব্যবহার করতে চেয়েছিল। কিন্তু আমেরিকা সোজা 'না' জানিয়ে দেয়। ঐ বিদ্রোহ দমন করার জন্য আকাশ পথে হামলা চালান'র অনুমোদনও আমেরিকা অঘোষিতভাবে সাদ্দামকে দিয়েছিল। কারণটাও অপ্রকাশিত থাকে নি। নিউইয়র্ক টাইমস-এর মধ্যপ্রাচ্য প্রতিনিধি আলান কওয়েল তাঁর প্রতিবেদনে জানিয়েছিলেন যে এ ব্যাপারে আমেরিকা ও তার ঐ অঞ্চলের জোট শরিকের এক খুব "নজর কাড়া' ঐক্যমত ছিল। ঐক্যমত এইখানে যে ঃ 'ইরাকী নেতার যত পাপই থাকুক, স্থায়ীত্ব বজায় রাখার দিক থেকে সে তার নিপীড়নের শিকারদের চেয়ে পশ্চিম ও ঐ—অঞ্চলের কাছে অনেক বেশী আশাপ্রদ'। টাইমস্ এর এক কূটনৈতিক প্রতিনিধি মন্তব্য করেন (সমালোচনা হিসেবে নয়) যে জনসমর্থন পুষ্ট কোন বিদ্রোহ রক্তে ডুবিয়ে দিলে নিহতের সংখ্যা মার্কিনী বোমায় নিহতদের সংখ্যাকেও সম্ভবত ছাড়িয়ে যাবে। ওয়াশিংটন ও তার মিত্রদের কাছে বরং এমন "লৌহমুঠি সম্পন্ন জুনতা' বেশী কাম্য যা ইরাককে এক ঐক্যে ধরে রাখবে, যেমন ধরে রেখেছে সাদ্দামের 'লৌহ মুঠি"। মানুষ হয় তো

দেখতে চায় না। কিন্তু এ সবই খবরের কাগজের প্রথম পাতা জুড়ে ছড়িয়ে ছিল। আর ঐ অঞ্চলে তো এ খবর সবারই জানা।

[David Bersania'র সাথে Noam Chomsky'র এক সাক্ষাৎ কারের (20 সেপ্টেম্বর 2001) অংশবিশেষ। Monthly Review, Nov. 2001]

যুদ্ধ একটা বাধলেই হলো। তখন আর অতশত চিন্তাভাবনা না করেই দেদার অস্ত্র কেনার অর্ডার দেওয়া যায়। কার্গিল যুদ্ধের সুবাদে 120 টি কন্ট্রাক্ট দেওয়া হলো চোখের নিমেষে, অবশ্য 75% কন্ট্রাক্টই যুদ্ধ শেষ হবার পর। 2175.4 কোটি টাকার মাল কেনা হলো যার 99% এসে পৌছলো যুদ্ধ শেষ হবার অনেক পরে। যা হোক কাজে লাগতে পারে। আর 2000 সালেই তো গুদামে তিনচার বার আগুন লেগে কত গোলা বারুদ হিসেবের খাতা থেকে মুছে গেলো। বারুদে আগুন লাগতে আর কত ক্ষণ!

এবার একটা পুরোন গল্প বলে এ পর্যায় শেষ করা যাক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কার ঘটনা। ব্রিটেনের "রয়াল এয়ার কোর্স"—RAF এর তখন যায় যায় অবস্থা। এমন সময় ব্রিটিশ কমান্ডার ইন চিফ ঠিক করলেন আর স্থলপথে নয়—এবার হবে আকাশ যুদ্ধ। মর মর সংস্থাটিতে এক সপ্তাহে এলো 77000 পাউন্ড স্টারলিং—RAF-র বিমান উড়লো মধ্যপ্রচ্যের দিকে। এরপর সাফল্য সুতরাং আরও অর্থ। RAF কে আর ফিরে তাকাতে হলো না।

কি করি ভেবে মরি, মন মাঝি ঠাহর দেখি নে

বহুদিন তেমন জুত মতো যুদ্ধ হচ্ছে না। অনেক দিন গেলো, বেশ কিছু খোঁচা খুঁচি হলো কিন্তু কৈ—নর্থর্যাপ গ্রুম্যান, রে থেয়ণ, জেনারেল ডায়নামিক্স, লক হিড মার্টিন প্রভৃতি যুদ্ধ ব্যবসার আমীর ওমরাহদের কপালের ভাঁজ পুরু হতে থাকলো। এদিকে বিশ্ব বাজারে মন্দাভাব বাড়ছে। গ্লোবালাইজেশনের পতাকা তেমন পত্ পত্ করে উড়ছে না। আমেরিকায় বেকারির হার অগাস্ট 2001 এ হলো 4.9% যা ছিলো জুলাই মাসে 4.5%, জাপানের GDP বার্ষিক হারের সাপেক্ষে 3.2% পড়ে গেলো (জুন-অগাস্ট 2001)। জুলাই মাসে জার্মানির শিল্প উৎপাদন পড়ে গেল 1.5%। ফ্রান্সের GDP বাড়লো মাত্র 0.3% (জুন-অগাস্ট 2001)। বড়দাদের অবস্থা কাহিল। এদিকে যুদ্ধ ব্যবসায়ীদেরও অবস্থা ভালো নয়। ট্যাঙ্ক আর যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণকারী জেনারেল ডায়নামিক্স-এর স্টক প্রাইস নেমে হলো 40 ডলার।

দত্যি-দানো খলনায়কের সন্ধানে

.... সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পড়ার সাথে সাথে "স্নায়ুযুদ্ধের" (cold war) সমাপ্তি মার্কিন শাসকশ্রেণীর কাছে নেতিবাচক ও ইতিবাচক দুধরনের ফলাফলই ডেকে এনেছে। 'অশুভ সাম্রাজ্য (Evil Empire) মিলিয়ে যাবার পর সামরিক খাতে হাজার হাজার কোটি টাকার বিশাল ব্যয় বরাদ্দের স্বপক্ষে কি করে যুক্তি দেখান যায়? এরই সাথে একসূত্রে বাঁধা রয়েছে প্রতিদ্বন্দ্বী বিভিন্ন পুঁজিবাদী রাষ্ট্র থেকে আসা ক্রমবর্দ্ধমান চ্যালেঞ্জ। 'স্নায়ুযুদ্ধ' কেন্দ্রিক ব্যাপক জোটের পরিপ্রেক্ষিতে এই রাষ্ট্রগুলি সাধারণভাবে মার্কিনী লক্ষ্যের সাথে খাপ খাইয়ে চলত।

কাজে কাজেই সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর থেকে মার্কিনী শাসকশ্রেণী 'স্নায়ুযুদ্ধে'র এমন এক বিকল্প খুঁজছিল, যা দিয়ে তাদের সাম্রাজ্যবিস্তারের ছককে যুক্তিযুক্ত করে তোলা যায়। অনেক রকম বিকল্পের প্রস্তাবই এসেছে : 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' "দুর্বৃত্ত রাষ্ট্রগুলির" ('Rogue states') বিরুদ্ধে লড়াই; "বিভিন্ন সভ্যতার মধ্য এক সংঘাত" (সামুয়েল হান্টিংটন এর ধারণা অনুযায়ী ইসলাম এবং চীন বনাম পশ্চিম); দুনিয়াজোড়া মাদক চালান ব্যবসার বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং মানবিকতার স্বার্থে হস্তক্ষেপ—এর কোনটাই এখনও পর্যন্ত সন্তোষজনক মনে না হলেও, স্নায়ুযুদ্ধের পরবর্ত্তীকালীন সামরিক ব্যয় বরাদ্দকে এরা বিপুল সংকোচন এর হাত থেকে বাঁচিয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে 1990 সালে কুয়েতের ওপর সাদ্দাম হোসেনের হামলা প্রায় ঈশ্বর প্রেরিত হয়ে দেখা দিল। কিন্তু উপসাগরীয় যুদ্ধে ইরাকী ফৌজের ওপর বিজয় এতই সম্পূর্ণ ও এতই বিধ্বংসী ছিল যে হোসেন আর জুজু হিসেবে তেমন বিশ্বাসযোগ্য রইলনা যার ভয় দেখিয়ে পৃথিবীজোড়া মার্কিন খবরদারীকে যুক্তিযুক্ত দেখান চলে। 1991 সালে জেনারেল কলিন পাওয়েল [উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় প্রধান সেনাপতি ও বর্তমান আমেরিকার প্রতিরক্ষা সচিব] সমস্যাটাকে এইভাবে রাখেন, 'এ ব্যাপারে বেশী করে ভাবুন। আমি আর দৈত্য-দানো খুঁজে পাচ্ছিনা। আমি আর খল নায়ক খুঁজে পাচ্ছিনা।' (এপ্রিল 9, 1991, টরোন্টো স্টার)

এতে কোন সন্দেহ নেই যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতার অলিগলিতে এ এক সমাধানের অতীত উভয়সংকট হিসেবে দেখা দিচ্ছিল............।

ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ও পেন্টাগনের ওপরে আক্রমণ এ সবই বদলে দিয়েছে। ক্রমবর্দ্ধমান অনিশ্চয়তা, ও অর্থনৈতিক

নিশ্চলতা-র শিকার ওয়াল স্ট্রীটের পক্ষে সত্যিকারের এক ভালো খবর এই যে সামরিক বরাদ্দ রাতারাতি একেবারে আকাশছোঁয়া হয়ে গেছে এবং অতি নিকট ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি আশা করা যাচ্ছে ফলে সামরিক ঠিকাদারদের শেয়ারের দর তরতর করে ওপরে উঠে যাচ্ছে।

বুশ-এর বক্তৃতার (20 সেপ্টেম্বর, 2001) পিছনে এক ভয়ংকর বাস্তবতা লুকিয়ে আছে। মাত্র একজন দ্বিমতপোষণকারী (ক্যালিফোর্নিয়ার প্রতিনিধি বার্বারা লী) ছাড়া গোটা মার্কিনী কংগ্রেস বুশ-কে তার সম্পূর্ণ নিজের খুশীমত এই ঝাপসা রূপরেখার যুদ্ধ চালাবার ক্ষমতা ছেড়ে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, কে শত্রু ঠিক করার নিরঙ্কুশ অধিকারও বুশেরই। এই যুদ্ধ দুনিয়া জোড়া বলে ভবিষ্যৎ বাণী ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে।..........অথচ মার্কিন নাগরিকরা এ ব্যাপারে এখনও অন্ধকারে যে ওসামা বিন লাদেন ও আফগানিস্থানর তালিবানরা ছাড়া আর কারা কারা এই শত্রু তালিকায় আছে, বা আফগানিস্থানের পর অন্য কোন জায়গাকে মার্কিনী ফৌজ হামলা করার জন্য বেছে নেবে। কাজেই বুশের ভাষণ কোন নির্দ্দিষ্ট ভৌগলিক সীমারেখা না মেনে, বা অস্ত্রপাতির ধরণের ওপর কোন নৈতিক বিধি নিষেধের তোয়াক্কা না করে একের পর এক সামরিক হস্তক্ষেপের ভিত্তি প্রস্তুত করছে।

Monthly Review নভেম্বর, 2001,

সুতরাং সমবেত কাতর আবেদন উঠলো উপরওয়ালার উদ্দেশ্যে—"ম্যাঘ দে, পানিদে, যুদ্ধ দে রে তুই"। তো সেই ডাক শুনেই তো গতবছর তিনি দিয়েছিলেন বসনিয়া-কসভো। উৎসাহে NATO-র নিজস্ব আইন ভেঙে ঝাঁপানো হলো যুদ্ধে—বহু দিন পরে জার্মানি তখন আউটডোর খেলায় নেমেছে। কিন্তু কৈ—তেমন জুত হলো কৈ। ফুস করে নিভে গেলো মিলিসোভিচ! মাল পত্তর সবই তো পড়ে রইলো গুদামে। রাগে দুঃখে কলিন পাওয়েলকে একবার বলেই ফেলতে হলো—"থিঙ্ক হার্ড অ্যাবাউট ইট। আয়্যাম রানিং আউট অফ ডেমনস। আয়্যাম রানিং আউট অফ ভিলেনস।"

কিন্তু কপাল বলে তো একটা কথা আছে (RAF যেমন জানে)। কোন্ "মাথা পাগলা" লোকেরা 11 সেপ্টেম্বর ঘটিয়ে দিল সেই বিশ্রী ঘটনা। সমস্ত পৃথিবীর মানুষ হতবাক, ব্যথিত। আর যুদ্ধ ব্যবসায়ীরাও হয়তো হতবাক—আনন্দে, উত্তেজনায়।

পরের কদিন পৃথিবীর সব বড় বড় শেয়ার বাজারে প্রায় সব কোম্পানির শেয়ারে ধস্—আর উঠতে লাগলো সমরাস্ত্র নির্মানকারী কোম্পানিগুলোর শেয়ার মূল্যের কাঁটা। দু'দিন পরে জেনারেল ডায়নামিক্স-এর সেনসেক্স হলো 90 ডলার। নর্থর‍্যাপ গ্রুম্যান 45 ডলার থেকে 100(+) ডলার (20% বাউন্স)। আর রেথিয়ন উঠলো সবচেচে উঁচুতে 26% বাউন্স নিয়ে, কারণ ঐ কোম্পানির তৈরি "তোহমাহক ক্রুইজ মিশাইল" ইতিমধ্যেই (1998)-এ আফগানিস্তানে ছোঁড়া হয়ে গেছে।

যার আছে নিরিখ নিরূপণ, দরশন সেই পাইয়াছে

নিরিখ যেন পাওয়া গেছে। টেরোরিজম। আফগানিস্তানের যুদ্ধ শেষ হবে অচিরেই। কিন্তু টেরোরিজম—সে তো হাতের কাছেই থাকবে, দেশে দেশে। আহা যুদ্ধ কত সহজেই ঘটানো যাবে। ধরুন নিজেরাই একটু তৎপর হলে—ভাষায়, জাতে, সম্প্রদায়ে, ধর্মে বিভক্ত মানব সমাজে কত সুযোগ ছড়িয়ে আছে! দরকার শুধু একটু উস্কানির বাতাবরণ, (স্মরণীয়, রাশিয়ার সঙ্গে লড়াইয়ের সময় আমেরিকা কর্তৃক লাদেন ও আফগানিস্তানি মুজাহিদিন গোষ্ঠীগুলোকে সহায়তার ইতিহাস), মাথাপাগলা যুবকের দল, অস্ত্র শস্ত্রের যোগান দারি আর একটু চোখ বুঝে থেকে সময় সুযোগ করে দেওয়া—যুদ্ধের জন্য হাপিত্যেশ করে বসে থাকার দিন শেষ। আফগানিস্তানের যুদ্ধ শেষ হলো কি হলো না, লেগে গেছে ইজরায়েল-পালেস্টাইন। তাছাড়া এলাকায় একটা উন্মাদনা আনা গেছে। আগামী বছরের ভারত, পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা বাজেটে এর প্রভাব চোখে পড়বেই—পৃথিবীর সব সম্ভাবনাময় অঞ্চলে একটা যুদ্ধ বাধিয়ে দিতে পারলেই হোল। আশপাশের সব দেশ মরীয়া হয়ে অস্ত্র কিনবে। আমেরিকা এসব বোঝে সেই দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে সময় থেকে। যে যুদ্ধের আশির্বাদে পৃথিবীর ঈশ্বর হয়ে ওঠা। সেই সুসময়ের কথা কি সে ভুলতে পারে—যখন বিশ্বযুদ্ধ শেষ দেখা গেলো পৃথিবীর মোট GDP-র এক তৃতীয়াংশের মালিক আমেরিকা।

এখন শুধু দেখা যুদ্ধবিরোধীরা তথ্যপ্রযুক্তির সুযোগ নিয়ে না দল পাকায়। আফগানিস্তান যুদ্ধের সময় তো ইন্টারনেটে শুধুই যুদ্ধ বিরোধীদের দাপট। আর তার চাপে পড়ে মিডিয়াও যেন কেমন কেমন! না হলে বোমায় জখম শিশুদের ছবি সারা পৃথিবীর খবরের কাগজের পাতায় পাতায় এভাবে ছাপা হয়?

গোলমেলে সঙ্গীত

ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ও পেন্টাগনে বিপর্যয়ের পর ক্লিয়ার চ্যানেল কমিউনিকেশন্ (এটা বহুসংখক মাধ্যমের এক যৌথ সংস্থা)—এর মালিকানাধীন 1200 পপ্ ও রক্ বেতার কেন্দ্রে অনুষ্ঠান পরিচালকদের কাছে কোম্পানী ম্যানেজমেন্ট-এর তরফ থেকে এক নির্দেশ জারী হয়েছিল। এই নির্দেশ-এ

"সাঙ্গীতিকভাবে গোলমেলে" ('lyrically questionable') 150 টা গানের এক তালিকা ছিল, যা বেতার সম্প্রচার করা চলবেনা। যেমন, এর মধ্যে ছিল লুই আর্মস্ট্রং-এর "এ এক অনবদ্য বিশ্ব" ("It's a Wonderful World"), পল সিমন-এর 'অশান্ত জলরাশির ওপর সেতু' ('Bridge over Troubled Water"—'When you're weary/feeling small/when tears are in your eyes/I will dry them all.) ও জন লেনন-এর "কল্পনাকর" (Imagine—"you may say I am a dreamer/ but I'm not the only one/ I hope some day you'll join us/ and the world will live as one")। স্পষ্টতই ক্লিয়ার চ্যানেল-এর উদ্দেশ্য ছিল অনুষ্ঠান পরিচালক ও বিপুল সংখ্যক শ্রোতাকে ওয়াশিংটনের 'যুদ্ধের' আহ্বান-এর পেছনে সামিল করা। কিন্তু এর বিরুদ্ধে এমন জোর হৈ-হল্লা শুরু হয়ে গেল—শুধু শ্রোতাদের তরফ থেকেই নয়, প্রধান প্রধান খবরের কাগজের সম্পাদকীয় পাতাতেও—যে, কয়কদিনের মধ্যেই গানের এই কালোতালিকা তুলে নেওয়া হল। বরং ব্যাপার দাঁড়ালো এই যে এই পরিকল্পনার এক উল্টোধাক্কা এলো— যুদ্ধবিরোধী বাণী বহন কারী সিমন ও লেননের গানগুলি 21 শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার দেশজোড়া সমস্ত বেতার কেন্দ্র থেকে শোনা গেল।

Monthly Revieve নভেম্বর, 2001

তথ্য সূত্র ঃ

১। The Times of India — 30 Sept. 2001.

২। The Statesman — 4th December, 2001.

৩। The Economist — Sept. 15th–21st, Sept 29–Oct 5th.

৪। Monthly Review — Sept. 2001.

Space Donated by :

A WELL WISHER

তৃতীয় পর্ব

বিষয় : পরিবেশ

সামগ্রিকভাবে জীবনের মানোন্নয়ন এবং গ্রহ-পৃথিবীকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বাসযোগ্য রেখে যাওয়া আজকের মানুষের সামনে কঠিনতম চ্যালেঞ্জ। মোকাবিলায় আমরা কিভাবে কি করছি বা করার চেষ্টা করছি তা জানা এবং নিরন্তর পর্যালোচনা করা তাই অত্যন্তই জরুরী। একাজ শুধু পন্ডিত বিশেষজ্ঞের নয়, আপামর জনসাধারণেরও। কারণ সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকা এর ওপর নির্ভরশীল। দৃষ্টিভঙ্গীগত একপেশেমি ভুল কর্মসূচীর জন্ম দিতে পারে এবং অপরিবর্তনীয় ক্ষতিও করতে পারে। এসব কথা মাথায় রেখে **বিষয় পরিবেশের** *অবতারণা। ইতিমধ্যে প্রকাশিত প্রথম দুই পর্বের রচনা অবলম্বনে* **পরিবেশ দূষণ পরিচিতি ও পরিমাপ** *শীর্ষক একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ভারতীয় পরিবেশ আইনগুলির পরিচিতি ও পর্যালোচনা তৃতীয় পর্বের বিষয়বস্তু। যে কেউ এ বিভাগের জন্য লেখা পাঠাতে পারেন। মতামত, সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর ওপর খবরাখবর, টিকা সমীক্ষাদিও প্রকাশের জন্য সাদরে বিবেচিত হবে।*

পরিবেশ আইন-কানুন : নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য

[চার]

থ্যাকতম পুরুল্যায়
লা গ সহরে লয়, কোশটাক দূরেত।
জমিন তো আগে টাঁড় ছিলি
ধান কুথা, চাষ কুথা?
হুঁ, জল হলি বটে বাঁধ থেনে
লতুন ধান এলি
পরথম পরথম কত ধান, ক-ত ডিংল্যা
দিনভর জমিত খ্যাটতম
আর পুরুল্যা সিনেমাত লতুন পালা ল্যাগলেই
হুড়া লাগাই দিতম
বিটা ছেইল্যা বিটি ছেইল্যা ক্যাউ বাদ ঝ্যাতো নাই,
পরানের ঢুসাঢুসি বুজুন্তিমালার লাচ
দেইখ্যার লেইগ্যা ছুট্টাছুটি প্যড়তো।
পাঁচ বছর গ্যালো নাই
জমিগুলান সা-ন হয়্যা গ্যালো
কপাল পুইড়ল আমারদের,
তাপর তো অ্যালম
আপুনকার দ্যাশেত
গতর খাটাই ভাত খাই।

ভারতীয় পরিবেশ আইনকানুনের সূত্র ধরে আমরা এসে পড়েছিলাম পরিবেশ আইনের আন্তর্জাতিক আঙিনায়। শিল্পোন্নত ইউরোপ-আমেরিকার জল-বাতাসের দূষণের প্রতিকার এবং জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার উদ্ভবের মূলে কিভাবে পরিবেশ-ভাবনা ক্রমশ বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসারিত হল, কিভাবে প্রকৃতির-সুরক্ষা ও সংরক্ষণের আন্দোলন বহুবিধ সমাজ রাজনৈতিক আন্দোলন এবং বিজ্ঞান কারিগরির নানা আবিষ্কার-উদ্ভাবন আত্মস্থ করে টেঁকসই তথা দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের এক সার্বিক বিশ্ববীক্ষায় উন্নত হল, তার সামান্য ইঙ্গিত তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছিল আগের কিস্তির আলোচনায় (বি ও বিঃ জানু-জুন, 2000)। এবার আমরা এই বিশ্বপরিবেশ ভাবনার প্রকৃতি, ও রূপায়নের সমস্যাদি নিয়ে আরও একটু গভীরে প্রবেশের প্রয়াস পেতে পারি। কিন্তু তার আগে এর অন্তর্নিহিত গুটিকয় বিশেষত্ব উল্লেখ দাবী করে।

এক। বিগত প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে বিকশিত হওয়া এই পরিবেশ ভাবনা চিন্তা ও কর্মকান্ডের পেছনে অন্যতম প্রধান ভূমিকা থেকেছে রাষ্ট্রপুঞ্জের এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের মধ্যস্থতায় ঘটা বহুস্তরীয় আন্তর্জাতিক আলোচনা-বিতর্ক। মতান্তর-ঝগড়া, টানাপোড়েন দরকষাকষি অবশ্যই ছিল, কিন্তু নিরন্তর আলোচনা-পর্যালোচনাই থেকেছে মূল প্রক্রিয়া। অনতি-অতীতের ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি, প্রত্যক্ষ যুদ্ধ ও বাজার দখলের প্রক্রিয়াদির কথা স্মরণে রাখলে এটাকে একটা মৌলিক পরিবর্তন হিসেবে দেখতে অসুবিধা হবার কথা নয়।

দুই। অপেক্ষাকৃত স্বল্প এই সময়ের মধ্যে *পরিবেশ*-এর যে ব্যাপ্তি ঘটেছে তা শুধুমাত্র ভৌগলিক নয় (1972-এ শিল্পোন্নত দুনিয়ার বাইরে মাত্র 11টি দেশে পরিবেশ সরকারি কাজকর্মের পরিসরে স্বীকৃত ছিল, কিন্তু 1980-তে 102টি স্বল্পোন্নত-উন্নয়নশীল দেশে পরিবেশ দপ্তর গড়ে উঠেছিল, পরে তা

আরও বেড়েছে, এখন পরিবেশ দপ্তরবিহীন দেশ নেই বললেই চলে)। বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, মানবিক ও দার্শনিক দিক থেকেও পুষ্ট ও বিস্তৃত হয়েছে পরিবেশকে নিয়ে পরিবেশকে ঘিরে ভাবনা ও কাজকর্ম। অর্থাৎ তার মূলগত পরিবর্তন ঘটেছে। উদ্ভবের প্রক্রিয়ার বিচারে এবং সম্ভাব্য ফলের নিরিখে প্রকৃত অর্থেই বিশ্বজনীন এই জীবনাদর্শ সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট বা দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন নামে অভিহিত। রূপায়ণ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে এর তত্বগত এবং প্রায়োগিক বিকাশ কিছুটা হয়েছে, অনেকটাই হবার অপেক্ষায়।

তিন। পরিবেশ-কেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উত্থান ঘটেছে নানাবিধ আর্ন্তজাতিক (ও জাতীয়) প্রতিষ্ঠান তথা ইনস্টিটিউশনের এবং আইনী এবং অন্যান্য ইনস্ট্রুমেন্ট তথা হাতিয়ারের। কিন্তু সেগুলি আগে থেকেই চালু বিভিন্ন ইনস্টিটিউশন (যেমন রাষ্ট্র) এবং ইনস্ট্রুমেন্টের (যেমন পুরনো আইনকানুন) অন্তর্ভুক্ত ধ্যানধারণা ও কর্মপদ্ধতির সংশোধন-পরিবর্তন দাবী করে। ফলে একটা আপাত বিরোধী-সংঘর্ষের পরিমন্ডল কমবেশী সর্বত্রই রয়েছে।

আন্তর্জাতিক পরিবেশ আইন : কি ও কিভাবে

অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যেই আন্তর্জাতিক আইনের বিশেষ ক্ষেত্র থেকে আন্তর্জাতিক পরিবেশ আইন ব্যাপ্তি ও গুরুত্বে কেন্দ্রীয় স্থান অধিকার করেছে।

তিন বা ততোধিক রাষ্ট্রের মধ্যে সাধারণ কোন চুক্তি— যেগুলি সাধারণত ট্রিটি, এগ্রিমেন্ট বা কনভেনশন নামে পরিচিত—আন্তর্জাতিক পরিবেশ আইনের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। এইসব চুক্তি বা সমঝোতা সম্পাদিত হতে পারে অঞ্চলবিশেষের কয়েকটি রাষ্ট্রের মধ্যে (যেমন উত্তর আমেরিকা, দঃ পূর্ব এশিয়া ইত্যাদি) আবার সেগুলি অঞ্চল নির্বিশেষে বিশ্বব্যাপী হতে পারে। এগুলি নিয়মিত হতে পারে আবার অনিয়মিতও হতে পারে। সাধারণত এইসব ট্রিটি, এগ্রিমেন্ট বা কনভেনশন একগুচ্ছ নীতিঘোষণা করে। স্বাক্ষরকারী দেশগুলি এইসব নীতি মেনে চলতে ইচ্ছুক বলে ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু তাই বলে সেগুলি সরাসরি ঐসব দেশের পক্ষে মেনে চলা বাধ্যতামূলক নয়। নরম আইন (Soft law), বহুপাক্ষিক পরিবেশ চুক্তি (Non-binding Agreements) ইত্যাদি বর্ণনা প্রযুক্ত হয় এইসব ক্ষেত্রে। স্টকহোম মানব পরিবেশ সম্পর্কিত ঘোষণাপত্র (কনভেনশন) বা পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক রিও ঘোষণাপত্র বা ঐ সময়েই ঘোষিত এজেন্ডা-21 (একটি বিস্তৃত খসড়া কর্মনীতি বলা যায়), বাধ্যতামুক্ত নরম আইনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

আরও কয়েকটি রাস্তায় আন্তর্জাতিক পরিবেশ আইনের উদ্ভব ঘটে। এসবের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল— বিভিন্ন আন্তর্জাতিক স্থায়ী বা আধাস্থায়ী সংগঠনের (রাষ্ট্রপুঞ্জের অধীনে বা বাইরে) গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ। সাধারণত এইসব সিদ্ধান্ত সংগঠনের সদস্য দেশগুলির ক্ষেত্রে মেনে চলা আবশ্যিক। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এর সর্বোত্তম উদাহরণ। উত্তর সাগর (North Sea) এবং উত্তর-পূর্ব আটলান্টিককে দূষণ ও বর্জ্য মুক্ত রাখার জন্য অসলো কমিশন, কয়েকটি আন্তর্জাতিক ফিসারিজ কমিশন, আন্তর্জাতিক হোয়েলিং কমিশন ইত্যাদির সিদ্ধান্তকেও মোটামুটিভাবে অবশ্য পালনীয় (Binding) চুক্তির পর্যায়ে ফেলা যায়।

বহু পাক্ষিক পরিবেশ চুক্তি (MEAs) গুলিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির উপর সাধারণ কিছু নীতিই ঘোষিত হয়ে থাকে। সেগুলি বাস্তবায়িত করার জন্য সাংগঠনিক, বৈজ্ঞানিক ও আর্থিক কিছু সংস্থানও সাধারণত করা হয়। কনভেনশন-পরবর্তী কোন বিশেষ অনুপূরক (Supplementary) সভায় সুনির্দিষ্ট পন্থাপদ্ধতি ও সময়সীমা নির্ধারণ করে কাজে নামার অঙ্গীকার ঘোষিত হয়, এগুলিকে সচরাচর 'প্রোটোকল' নামে অভিহিত করা হয়। ভিন্ন ভিন্ন দেশে পর্যালোচনার পর সংশ্লিষ্ট দেশগুলি অনুমোদন (ratify) করলে এগুলি একটি অবশ্যপালনীয় (Binding) আইনে পরিণত হয়। এসব প্রক্রিয়ার জন্য সময়সীমা এবং আরও কিছু নিয়ম-শর্ত পালন করতে হতে পারে। কনভেনশন—প্রোটেকল ইত্যাদির বিষয়বস্তু আবার পুরনো বা নতুন কোন স্থায়ী আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক আইনে রূপান্তরিত হতে পারে, বিভিন্ন দেশের জাতীয় আইনেও প্রতিফলিত হতে পারে। যেমন ভারতে পরিবেশ সম্পর্কিত বিশেষ আইন প্রণয়ন শুরু হলো স্টকহোম সম্মেলনের পরে, ঐ সম্মেলনের নীতিসূত্র অনুসরণে।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে বহুপাক্ষিক বা আন্তর্জাতিক চুক্তির চরিত্রই এমন যে সেগুলি সরাসরি রূপায়ণে অগ্রসর হওয়া যায়। কোন বিশেষ দেশের নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বিষয়গুলির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত না হলে এটা সম্ভব। যেমন, মেরু ভল্লুক, ডলফিন বা তিমি সংরক্ষণ, সমুদ্রে বর্জ্য-আবর্জনা না ফেলা ইত্যাদি। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আন্তর্জাতিক চুক্তির রূপায়ণের জন্য বিভিন্ন দেশের আভ্যন্তরীণ উৎপাদন-আচরণ-পদ্ধতির সংস্কার বা নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। যেমন অম্লবৃষ্টির প্রকোপ কমাবার নীতি বাস্তবায়িত করতে হলে সালফার ডাই অক্সাইড বা নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড গ্যাসের নির্গমণ কমাতে হবে। পৃথিবীর উত্তাপ বেড়ে যাবার প্রবণতা রুখতে হলে কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমন,

ক্লোরোফ্লোরো কার্বন যৌগ সমূহের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। যে কোন দেশের শিল্প, শক্তি-ব্যবহার, পরিবহন, কৃষি এগুলির সঙ্গে যুক্ত। অতএব উপযুক্ত জাতীয় আইনকানুন করতে হবে। জলাভূমি বা অরণ্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে গৃহীত আন্তর্জাতিক নীতিও দেশীয় অনুপূরক আইনপ্রণয়ন না করে রূপায়ণ সম্ভব নয়। অবশ্য যে কোন ক্ষেত্রেই, সুষ্ঠু রূপায়ণে আন্তরিক হতে হলে, অন্যান্য কিছু ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে হয়। উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান বা দপ্তর চিহ্নিত করা বা গড়ে তোলা, কর্মী নিয়োগ, দায়িত্ব বন্টন, অর্থ বরাদ্দ, পুরনো আইনকানুনের সংস্কার ইত্যাদি সবই সেইসব ব্যবস্থাদির অন্তর্গত। যথোপযুক্ত ইনস্টিটিউশন এবং ইনস্ট্রুমেন্ট না থাকলে নীতি ঘোষণাসমূহ সুন্দর সুন্দর রিপোর্ট হিসেবেই লাইব্রেরীর শোভা বর্দ্ধন করে।

আন্তর্জাতিক পরিবেশ আইনের রূপায়ণ ও কার্যকারিতা : বিরোধ

আন্তর্জাতিক পরিবেশ আইন যে মূল প্রক্রিয়ায় গড়ে ওঠে তার একটি আভাসী রূপরেখা তুলে ধরার চেষ্টা করা হল মাত্র। বাস্তবে বিষয়টি যথেষ্ট জটিল ও সমস্যাসংকুল। আবার, চুক্তি সম্পাদন ও রূপায়ণের মধ্যেও আছে কয়েক সমুদ্র ব্যবধান। সব দেশের আন্তরিকতা ও সততাও সর্বদা প্রশ্নাতীত থাকে না। আন্তর্দেশীয় এবং অন্তর্দেশীয় বিরোধী স্বার্থ বারবার বিশ্বদরবারে করা অঙ্গীকার অস্বীকার করে, পিছু হঠে। কিছু ক্ষেত্রে আবার সত্যিই সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দেয়, দু-একটি উদাহরণ ব্যাপারটিকে খানিকটা স্পষ্ট করে তুলতে পারে।

(*এক*) বিশ্বের আঙিনায় ভারত বরাবরই অন্যতম উদ্যোগী অংশগ্রহণকারী। স্টকহোম থেকে রিও যাত্রাপথে বহু আন্তর্জাতিক আলোচনায় ভারতের পক্ষ থেকে বহু প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, অঙ্গীকার করা হয়েছে। দেশের মধ্যে যথেষ্ট না হলেও অনেক নির্দিষ্ট আইন রচিত হয়েছে, জাতীয় নীতি-ঘোষণা করাও হয়েছে। কিন্তু সেগুলির রূপায়ণে ত্রুটি-গাফিলতির শেষ নেই। ইতিমধ্যেই আমরা তা আলোচনা করেছি। বহুক্ষেত্রেই এর দ্বারা যা ঘটে তাকে একটি বাক্যে বলা যায়—পরিবেশ-সম্পদের অন্যান্য অংশের ভোগদখলকারী, বিত্ত ও ক্ষমতারী অধিকারী ক্ষুদ্রাংশ দেশবাসীর স্বার্থের যূপকাষ্ঠে বৃহদংশ বঞ্চিত দেশবাসীর, পরিবেশের ও অনাগত প্রজন্মের প্রয়োজনকে বলি দেওয়া। অথচ ভারতের সরকারি প্রতিনিধিরা যখন বিশ্বসভায় বর্ক্তৃতা-বিতর্ক করেন তখন দরিদ্র দেশবাসীর জন্য, পরিবেশের জন্য তাঁদের সওয়াল, সরকারের কঠোর সমালোচককেও লজ্জা দেয়। অবশ্য, শুধুমাত্র ভারতের ক্ষেত্রেই নয়, কমবেশি সমস্ত অনুন্নত-স্বল্পোন্নত দেশের বেলাতেই একথা বলা যায়।

(*দুই*) অনুন্নত-উন্নয়নশীল দেশের এহেন আচরণের জন্য উন্নত দেশগুলির ভূমিকা বা আচরণও কম দায়ী নয়। বিশাল এক পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর 'উন্নয়নের' চিন্তা প্রতিনিয়ত তাড়া করে না উন্নত দেশগুলিকে। তারা আন্তর্জাতিক পরিবেশ আইন রূপায়ণে কতটা তৎপর ও আগ্রহী ?

দু-একটি বিশেষ (ও অপেক্ষাকৃত সরল) উদাহরণ তুলে ধরা যাক।

দেশ-সীমা লঙ্ঘনকারী বায়ুদূষণ যা অম্ল-বৃষ্টি ঘটায় তার উপর 1979-তে যে কনভেনশন হয়, তার অনুসরণে 1985 ও 1988-তে দুটি প্রোটোকলে যথাক্রমে সালফার ডাইঅক্সাইড ও নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড নির্গমন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণে কমিয়ে ফেলার চুক্তি হয়। প্রধানত উন্নত দেশগুলির মধ্যে (ইউরোপ-আমেরিকা-কানাডা) সীমিত এই প্রোটোকলদুটি এখন পর্যন্ত সবচেয়ে সফলভাবে পালিত হয়েছে, যদিও অংশগ্রহণকারী সবগুলি দেশের সাফল্য সমান নয়।

ভূপৃষ্ঠের উপরে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের ওজোন-স্তর সুরক্ষার লক্ষ্যে ভিয়েনা কনভেনশনে (1985) ঘোষিত নীতির রূপায়ণের জন্য স্বাক্ষরিত হয় মন্ট্রিল প্রোটোকল (1987)। এতে ওজোন-বিধ্বংসী ক্লোরোফ্লোরোকার্বন যৌগের (CFC) উৎপাদন ও ব্যবহার ধাপে ধাপে কমিয়ে ফেলার পরিমাণ ও সময় বেঁধে দেওয়া হয়। যেহেতু উন্নত দেশগুলির তুলনায় উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এগুলির ব্যবহার অনেক কম, তাই সময়সীমা মানার ক্ষেত্রে তাদের কিছুটা ছাড় দেওয়া হয়। নানা ঘাটতি-গাফিলতি সত্ত্বেও মন্ট্রিল প্রোটোকলও অনেকটা সফল।

মন্ট্রিল প্রোটোকলে গ্রীন হাউস গ্যাসগুলির (যে সব গ্যাসীয় যৌগাদি পৃথিবীকে উত্তপ্ত করে তোলার জন্য দায়ী বলে চিহ্নিত করা গেছে) মধ্যে কেবলমাত্র CFC-গুলিকেই নিয়ন্ত্রণ করার কথা ছিল। কিন্তু কার্বন ডাই অক্সাইড যা সবুজঘর অভিক্রিয়া (Greenhouse effect)-র 60 শতাংশের জন্য দায়ী বা অন্যান্য গ্রীন হাউস গ্যাস নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়নি। তাছাড়া, পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া আসলে আরও বড় ব্যাপার—পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তনেরই—একটি দিক। তাই 1992-তে আবার বসে কমিশন—এবার লক্ষ্য পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তন ঠেকানো (United Nations Framework Convention on Climate Change বা UNFCC)। এই কনভেনশনের অনুপূরক কিয়োটো প্রোটোকলে (1997)—178 টি দেশ এই সিদ্ধান্তে সায় দেয় যে, যেহেতু গ্রীন হাউস গ্যাস দূষণের জন্য মূল দায়ভাগ সবচেয়ে শিল্পোন্নত 38 টি দেশের, 2012 সালের মধ্যে তারা 1990 সালের

নিজ নিজ মাত্রার 5.2 শতাংশ গ্রীন হাউস গ্যাসদূষণ কমিয়ে ফেলবে। অবশ্যই এর জন্য ঐসব দেশকে কিছু ক্ষতিস্বীকার করতে হবে। দূষককেই মূল্য দেওয়ার নীতি (Polluters Pay Principle) এবং আন্তঃরাষ্ট্র দূষণের ক্ষেত্রে দূষণকারী দেশের দায়িত্ব নেবার নীতির প্রস্তাব এসেছিল 1974 সালে OECD'র পরিবেশ কমিটির কাছ থেকে। OECD (Organization for Economic Co-operation & Development)-তে ছিলো কয়েকটি ইউরোপীয় দেশ, আমেরিকা, জাপান, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড—যারা সকলেই শিল্পোন্নত। এই নীতি মেনেই দেশে দেশে পরিবেশ আইন রচিত হয়েছে এবং 1992-এর রিও-সম্মেলনে একে আনুষ্ঠানিকভাবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও দেওয়া হয়েছে। কিয়োটো প্রোটোকল এই নীতিই অনুসরণ করেছে মাত্র। কিন্তু কিয়োটো প্রোটোকলকে সরকারিভাবে অনুমোদন (ratify) করার পথে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির মধ্যে বহু টালবাহানা, ঠেলাঠেলি, চাপান-উতোর চলেছে। অবশেষে সম্প্রতি (নভেম্বর, 2001) ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও জাপান এই চুক্তি অনুমোদনে রাজী হয়েছে। কিন্তু আমেরিকা এককভাবে এই প্রোটোকল মানতে অস্বীকার করেছে। আমেরিকার সাফ কথা—এর ফলে তার শিল্প ও অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাছাড়াও আমেরিকার অভিমত ভারত বা চিনের মাথাপিছু গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গমন কম হতে পারে কিন্তু বিপুল জনসংখ্যার কারণে নির্গত গ্যাসের মোট পরিমাণ মোটেই উপেক্ষনীয় নয়। ধানচাষ বা পশুপালনে নির্গত মিথেন (একটি গ্রীনহাউস গ্যাস) থেকে দূষণ করে প্রধানত ভারত ও চিন—কাজেই তাদের ছাড় দেওয়া চলে না।

পরিবেশ ও উন্নয়নের মেলবন্ধন : দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের বিশ্ববীক্ষা

আপাতত একটু থমকে দাঁড়িয়ে দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের বিশ্ববীক্ষার স্বরূপ একটু বুঝে নেওয়া যাক।

রিও'র *পরিবেশ ও উন্নয়ন* বিষয়ক সম্মেলনের (বসুন্ধরা সম্মেলন, 1992) প্রস্তুতি হিসেবে ব্রাড্‌ল্যান্ড কমিশন 'আমাদের সাধারণ ভবিষ্যৎ' (Our Common Future) শীর্ষক প্রতিবেদনে দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি নির্দেশ করেন। এতে বলা হয়, দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন এমন এক উন্নয়নপ্রক্রিয়া যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজন মেটানোর ক্ষমতাকে খর্ব না করে বর্তমানের উন্নয়নকে ধারণ করতে সমর্থ হবে। দরিদ্র মানুষরা প্রাকৃতিক সম্পদের ন্যায্য অংশের মালিকানা ও ভোগে বঞ্চিত বলেই তারা দরিদ্র আর প্রাপ্যের চেয়ে বেশী প্রাকৃতিক সম্পদের ভোগের সূত্রেই ধনীরা ধনী—এই ইঙ্গিতও দেওয়া হয় ঐ রিপোর্টে। প্রাকৃতিক সম্পদের বন্টন ও ভোগে বৈষম্য দূর করা, তাই দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন কর্মসূচীর আবশ্যিক অঙ্গ। আবার জল বাতাস মাটি জীববৈচিত্র্য—এগুলি হল প্রাথমিক সম্পদ। এসবের দূষণ, অবনমন বা বিলুপ্তি যেহেতু ভোগের পরিমাণ-প্রকৃতির সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত তাই পৃথিবীর সামগ্রিক দূষণভারের বৃহদংশই অতিভোগীদের অবদান। দূষণ-প্রতিরোধ, প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্যের সুরক্ষা-সংরক্ষণও তাই দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অংশ। সামগ্রিকভাবে পৃথিবীর সব মানুষের জীবনের মানোন্নয়ন, উদ্ভিদসহ সমস্ত জীবপ্রজাতির স্বাভাবিক প্রাকৃতিক অস্তিত্বের অনুকুল অবস্থার পুনরুদ্ধার ও তা বজায় রাখা-এসবও দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের আবশ্যিক শর্ত।

মানুষের জীবনের মানোন্নয়ন শুধু বেশী বেশী ভোগের মধ্য দিয়েই আসে না—এমনকি ভোগ জীবনমানের অবনতিও ঘটাতে পারে। মানবোন্নয়ন হল মানুষের মুক্তি—ক্ষুধা থেকে, বৈষম্য থেকে, বন্দীদশা থেকে। মানবোন্নয়ন হল জীবনকুশলতার বিকাশ, সক্ষমতার প্রসার, স্বাধীনতার ক্রমবিস্তৃত আস্বাদন। পৃথিবীর সব মানুষ পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে মানুষ ও আর সব জীবপ্রজাতির দীর্ঘমেয়াদী অস্তিত্ব সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুনির্দ্দিষ্ট পদক্ষেপে এগোতে পারে। আজকের দিনের উন্নত বিজ্ঞান কারিগরী এবং মানুষের চিরায়ত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সেক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়। প্রাকৃতিক সমস্ত জীবপ্রজাতির মতই পার্থিব সমস্ত মানবগোষ্ঠীর নিজস্ব সাংস্কৃতিক সামাজিক বৈশিষ্ট্যের সংরক্ষণ ও প্রতিপালন অবশ্যই দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের অন্তর্ভুক্ত।

দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের বিশ্ববীক্ষায় মানবাধিকারের প্রসঙ্গও স্বভাবতই এসে পড়ে। জীবন ও জীবিকার অধিকার, স্বাস্থ্য ও সংস্কৃতির অধিকার কিভাবে রক্ষিত হবে যদি না মানুষ পায় একটি দূষণমুক্ত উপযুক্ত পরিবেশ? নারী ও শিশুদের স্থান, মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষার প্রশ্ন বাদ দিয়ে দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন এগোতে পারে না। এমনকি দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন অনাগত মানবপ্রজন্ম এবং মূক জীব-জীবাণুর অধিকারও অস্বীকার করতে পারে না। দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন, মানবাধিকার ও শান্তি অখন্ড ও অবিভাজ্য।

দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নচিন্তা প্রাকৃতিক ইকোসিস্টেমের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াপদ্ধতির অনুসরণে দীর্ঘস্থায়ী অস্তিত্বের জন্য যৌথক্রিয়া ও বৈচিত্র্যকে প্রাথমিক গণ্য করে। এই পৃথিবী একটি বিশাল ইকোসিস্টেম—অতিক্ষুদ্র (micro), মাঝারি (meso) এবং বড় বড় অসংখ্য ইকোসিস্টেমের এক অপূর্ব সমাহার, একটি জাল (web)। এর বৈচিত্র্যের সামগ্রিকতাই

এর অস্তিত্ব ও ধারাবাহিকতার ভিত্তি। তাকে আঘাত করা, ব্যাহত করা বা বিনষ্ট করা, মৃত্যুর দিকেই অগ্রসর হওয়ার সামিল।

একেবারে অত্যাধুনিক কিছু শহর-নগর বাদ দিলে পৃথিবীর সর্বত্রই ইকোসিস্টেমগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট আছে মানুষ। আপাত পশ্চাৎপদতা বা উন্নয়নহীনতার মধ্যেও লুকিয়ে আছে এমন সব পন্থা-প্রকরণ, জ্ঞান-দক্ষতা-সদিচ্ছা-পারস্পরিকতা, প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে এবং মানুষের জীবনকে পূর্ণতা দিতে যেগুলির ভূমিকা অপরিহার্য হলেও এতদিন স্বীকৃতি পায় নি। এমনকি পরিশীলিত গবেষকদেরও নতুন করে জানতে বুঝতে শিখতে হচ্ছে এইসব 'ট্রাডিশনাল ইকোলজিক্যাল নলেজ' (TEK)-এর গুরুত্ব।

সামগ্রিকভাবে এই প্রক্রিয়াকে আমরা অবশ্যই বিশ্বপরিবেশ আন্দোলন বলে অভিহিত করতে পারি। পরিবেশ ও উন্নয়নের মেলবন্ধনের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক সিদ্ধান্তে উপনীত হবার প্রক্রিয়াও একটি বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া। স্টকহোম-পূর্ববর্তী অধ্যায়ে যদি 'উন্নত' উত্তর গোলার্ধ পথ দেখিয়ে থাকে, তবে স্টকহোম পরবর্তী অধ্যায়ে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা 'অনুন্নত' দক্ষিণ গোলার্ধের। এটা এমনি এমনি হয়নি বা উন্নত দেশগুলি অনুন্নত দেশের প্রতি দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করেনি। ইউরোপ আমেরিকার উন্নতির মূলে বিজ্ঞান-কারিগরী শিল্প বাণিজ্য সফল ভূমিকা নিতে পারতো না এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার জিন- সম্পদের যোগান না পেলে। শিল্পের কাঁচামাল হিসেবেই হোক (কাগজের জন্য বনসম্পদ, কাপড়ের জন্য তুলো, ধাতুর জন্য খনিজ ইত্যাদি) আর কৃষিজ ভোগ্যপণ্য হিসেবেই হোক (চা, কফি, বাদাম, চিনি, তামাক ইত্যাদি) উত্তরের ভোগের যোগান এসেছে দক্ষিণ থেকে। উত্তরের পরিবেশ স্বাভাবিকভাবেই বহুলাংশে অনুর্বর ও জৈবদরিদ্র, দূষণে তা আজ আরও রিক্ত-নিঃস্ব হয়ে উঠেছে। দক্ষিণেও এই প্রক্রিয়া ক্রমবর্ধমান। একে থামানো না গেলে প্রাকৃতিক জিন সম্পদের উৎসভূমিই অচিরে বন্ধ্যা হয়ে যাবে। একথা বুঝেছেন উত্তর গোলার্ধের কিছু মানুষ। তাঁরা তাই আজ দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের একনিষ্ঠ সমর্থক। দারিদ্র, সমাজ-অর্থনৈতিক ন্যূনতা এবং উন্নয়নহীনতা কাটিয়ে ওঠার আন্দোলন পরিবেশ আন্দোলনই। দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের লক্ষ্যে তাকে পরিচালিত করাই আসল কথা। ভারতে একথার তাৎপর্য বোঝা সহজ কারণ, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী তার বীজ বপন করে গেছেন, অমর্ত্য সেন তাকে আরও প্রসারিত করছেন। এগুলি সবই গোটা বিশ্বের উত্তরাধিকার।

সংঘাত : দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন বনাম বাণিজ্য-বিশ্বায়ন

বাস্তব পৃথিবী অনেক জটিল। বিভেদ-বৈষম্যই এখনও চালকের আসনে। দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের স্বপ্ন যদি মানবজাতির একাংশের কাছে নতুন আশা-উদ্দীপনার হাতছানি দিয়ে থাকে, মানবজাতিরই অপর এক অংশ তখন শঙ্কিত হয়েছে, সন্ত্রস্ত হয়েছে, ক্রমবর্ধমান ভোগে 'উন্নতি'র নতুনতর পথের সন্ধান করেছে। আমেরিকা তাদের নেতৃত্ব দিয়েছে।

শুধু গ্রীনহাউস গ্যাস সংক্রান্ত কিয়োটো প্রোটোকলই নয়, পরিবেশের সুরক্ষা-সংরক্ষণ, তার দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহার এবং দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের লক্ষ্যে নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপে, প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে আমেরিকা বার বার বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্টকহোম সম্মেলন চলাকালীনই আমেরিকার সঙ্গে অন্যান্য দেশের, বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের বিরোধ স্পষ্ট হয়। বিষাক্ত ও বিপজ্জনক রাসায়নিকের তালিকা মানতে চায় না আমেরিকা, বায়ুমন্ডলে নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণের পরীক্ষা বন্ধের প্রস্তাবেও আমেরিকা ভিন্নমত পোষণ করে। তারপর যত দিন গড়িয়েছে পৃথিবীর সব মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দীর্ঘমেয়াদী উন্নত বিশ্ব গড়ার অঙ্গীকার যত স্পষ্ট হয়েছে, অনেকেই ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে, আমেরিকা প্রতিরোধ করেছে। এমনকি 1992-তে রিও সম্মেলনের সময়ে যে জীববৈচিত্র্য কনভেনশন দেশগুলির প্রাথমিক স্বাক্ষরের জন্য রাখা হয়েছিল, তাতেও আমেরিকা স্বাক্ষর দেয় নি। এই কনভেনশনের প্রস্তাব ছিল বিভিন্ন দেশের জীববৈচিত্র্যের উপর সেইসব দেশেরই স্বত্ব থাকবে। জীববৈচিত্র্য কনভেনশনের নীতিপ্রস্তাব মেনে নিলে আমেরিকার বায়োটেকনোলজি শিল্প মার খাবে—এই ছিল তার আশঙ্কা। রাষ্ট্রপুঞ্জের ভূমিকা নিয়ে আমেরিকা বার বার অসন্তুষ্ট হয়েছে, কঠোর সমালোচনা করেছে, এমনকি রাষ্ট্রপুঞ্জকে দেয় অর্থও আটকে দিয়েছে। রিপাবলিকান সরকারের আমলেই এসব ঘটেছে আরও বেশী করে।

দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্রপুঞ্জের নেতৃত্বে বিশ্ব যখন এক নতুন দিকে মোড় নেবার অপেক্ষায়, রিও সম্মেলনের ঘোষণাপত্র এবং এজেন্ডা-21 থেকে যখন সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী নিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাবার মুহূর্ত সমাগত, ঠিক তখনই (1995) বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organization, WTO) পূর্ণ মহিমায় আত্মপ্রকাশ করল বাণিজ্যের বিশ্বায়ন, মুক্ত প্রতিযোগিতা, পেটেন্ট-স্বত্বের মৌলিকতা (TRIPS) ইত্যাদির পসরা নিয়ে। দুনিয়ার যেখানে যত ভোগপ্রবক্তা—তৃতীয় বিশ্ব সহ—এতদিন ম্রিয়মান বোধ করছিল—উল্লাসে ফেটে পড়তে

চাইল। তাদের মতে WTO 'র পথই বিশ্বের মুক্তির পথ, অর্থনীতির মুক্তির পথ, উন্নয়নের পথে। তা কতটা ঠিক ইতিহাসই তার বিচার করবে, কিন্তু ইতিমধ্যেই বহু সমীক্ষায় ধরা পড়ছে—দেশে দেশে দারিদ্র বাড়ছে, বৈষম্য, অন্যায় ও ঘৃণা বাড়ছে, দম্ভ জেদ আর হিংসার মানসিকতা মাথা চাড়া দিচ্ছে। দরিদ্র-অধ্যুষিত দেশে ওষুধের দাম বাড়ছে, জনস্বাস্থ্যের জরুরী প্রয়োজনেও জীবনদায়ী ওষুধ তারা নিজেরা উৎপাদন করতে পারছে না, পেটেন্ট-স্বত্বের নাগপাশে আবদ্ধ ওষুধকে বেশীমূল্যে বহুজাতিকের কাছ থেকেই তারা কিনতে বাধ্য হচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশগুলি যেসব ক্ষেত্রে রপ্তানী প্রচুর বাড়বে বলে প্রলুব্ধ হয়েছিল, তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে, উল্টে আমদানী বেড়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত, জিন দস্যুতা আটকানো যাচ্ছে না।

এই প্রবণতার হদিস পেতে দেরী হয়নি উন্নত দেশেরই শিক্ষিত সচেতন বুদ্ধিজীবিদের একাংশের। স্বতস্ফূর্ত আন্দোলনে তারা বানচাল করে দিয়েছিল সিয়াটল (আমেরিকা, 1999) ও জেনোয়ার (ইতালি, 2001) WTO'র মন্ত্রীপর্যায়ের বৈঠক। অবশেষে অভূতপূর্ব নিরাপত্তা-বেস্টনীর মধ্যে দোহাতে বৈঠক হয়েছে বটে, কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলির উদ্বেগ-হতাশা গোপন থাকে নি। ম্যারাকাশের বৈঠকের মতো দোহা বৈঠকেও সংশোধিত ঘোষণা-পত্রে আশ্বাস দিতে হয়েছে যে বাণিজ্য-কেন্দ্রিক বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নকে বিসর্জন দিয়ে হবে না।

বিশ্বায়িত বাণিজ্য ও সন্ত্রাস নাকি বিশ্বায়িত দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন ও শান্তি?

বিগত কয়েক বছর ধরে আমেরিকা আরও কি কি করেছে ও করছে? একতরফাভাবে আন্তর্জাতিক মিসাইল প্রসার রোধ চুক্তি (Antiballistic Missile Treaty বা ABM চুক্তি) লঙ্ঘন করে অন্তরীক্ষে আকাশী আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, নতুন, বিপুল অর্থব্যয়ের মিসাইল কর্মসূচী নিয়ে অগ্রসর হয়েছে ; জীবাণু-যুদ্ধ রোধে রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্যোগে গৃহীত আন্তর্জাতিক চুক্তিও মেনে চলতে অস্বীকার করেছে। দুটি চুক্তিই প্রায় 30 বছরের পুরনো। (সম্প্রতি আমেরিকা সিটিবিটি (CTBT) থেকেও পিছু হঠেছে বলে খবরে প্রকাশ)। অস্ত্রশস্ত্রে ব্যবসা ও চোরাচালান নিয়ন্ত্রণের চুক্তি থেকেও আমেরিকা একতরফাভাবে সরে এসেছে। বুশ প্রেসিডেন্ট হবার পর এসব প্রক্রিয়া গতি ও অর্থ পেয়েছে।

এহেন পরিস্থিতিতে 11 সেপ্টেম্বর, 2001 নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের দুই স্তম্ভ সন্ত্রাসবাদী বিমানহানায় ধ্বংস হল। ওয়াশিংটনের পেন্টাগনের অফিসের একাংশও বিধ্বস্ত হল একই রকমভাবে। হঠকারী, ক্ষমাহীন, অমানবিক এই সন্ত্রাস আক্রমণ যারাই ঘটিয়ে থাকুক তারা আসলে কর্পোরেট—সামরিক আমেরিকা, বিশ্ব বাণিজ্যের বেড়াজালে পৃথিবীর প্রভুত্বকামী আমেরিকাকেই মদত দিল। গণতন্ত্রী, মানবতাবাদী, দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের পৃষ্ঠপোষক আমেরিকাকে আঘাত করে বসল। পৃথিবীর ও দেশবাসীর উদ্বেগ-আশঙ্কা-বিহ্বলতা সহানুভুতিকে মূলধন করে কর্পোরেট সামরিক আমেরিকা ঝাঁপিয়ে পড়েছে একটি দেশের উপর—দেশহীন শত্রু সন্ত্রাসবাদকে নির্মূল করার শপথ নিয়ে,—এ নাকি অনন্ত ন্যায়ের পথে অভিযান! নির্বিচার বোমাবর্ষণে নিহত হয়েছে শিশু-বৃদ্ধ-নারী সহ সাধারণ নিরীহ আফগান—যাদের দুই তৃতীয়াংশই, এই খাদ্য উদবৃত্তের সময়েও, উদরপূর্তির জন্য সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। পৃথিবীর সবচেয়ে অনুন্নতদের অন্যতম, সবচেয়ে কম খাবার পাওয়া একটি দেশের উপর সবচেয়ে উন্নত একটি দেশ একতরফা আক্রমণ চালিয়ে ধ্বংস করেছে অনেক সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, ধ্বংস করেছে প্রকৃতি—পরিবেশ এমনকি রেড ক্রসের মানবিক সাহায্যের অফিস।

বিশ্বমানবের মুক্তির আর্তি রূপ পাচ্ছিল যে মানবাধিকার ঘোষণায়, স্টকহোম ও রিও সম্মেলনের ঘোষণায়, বিশ্ব সংস্কৃতি ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের সুরক্ষার আন্তর্জাতিক ঘোষণায় (1972)—সেসবই আজ প্রহসনে পর্যবসিত। বহু কৃতিত্বের অধিকারী হলেও যে রাষ্ট্রপুঞ্জ নোবেল পুরস্কার তো পায়ই নি, বার বার যার জুটেছে তিরস্কার—আমেরিকার সন্ত্রাসবাদী অভিযানে স্বীয় ভূমিকা পালনে ব্যর্থ সেই রাষ্ট্রপুঞ্জ ও তার প্রধানের জুটে গেল নোবেল পুরস্কার! সমস্ত পৃথিবী মিলে আলোচনা করে সন্ত্রাসবাদের আর্থিক ও অন্যান্য ভিত্তি দুর্বল করার পথে না গিয়ে পাল্টা-সন্ত্রাসে লিপ্ত হওয়ায় আশু লাভ কর্পোরেট-সামরিক আমেরিকার। তার অস্ত্র ব্যবসা আবার ফুলে ফেঁপে উঠবে, আবার প্রতিষ্ঠিত হবে তার আর্থ-সামরিক আধিপত্য, কঠোর আইনে দমন করা যাবে গণতান্ত্রিক সমালোচনার কণ্ঠ (দেশে দেশে তার হিড়িক পড়েছে)। আর কি চাই?

ভোগবাদী লুণ্ঠন আর সন্ত্রাস (সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা নিয়ে যতই কেন রাষ্ট্রপুঞ্জ দীর্ঘ বৈঠক করে অসফল হোক) পরস্পরের পরিপূরক। ভোগীর প্রতিবিম্ব সন্ত্রাসবাদী। কোন এক ওসামা এবং তার আশ্রয় ও মদতদাতা মৌলবাদী কিছু মানুষকে এভাবে মেরে ফেলে অনন্ত ন্যায় ও স্বাধীনতার পথ সুগম হবে, না অনন্ত সন্ত্রাসের,—তা ইতিহাস হয়তো একদিন বলবে। কিন্তু আপাতত এসবই যে দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন ভাবনাকে স্তব্ধ করে WTO 'র বাণিজ্য-কেন্দ্রিক বিশ্বায়নের প্রসারের স্বার্থে তা অকস্মাৎ জেনারেল কলিন পাওয়েলের উক্তিতে ধরা পড়ে যায়—বিশ্বায়ন (WTO পন্থা)-

বিরোধিতা আর সন্ত্রাসবাদ আসলে একই শত্রু। প্রেসিডেন্ট বুশের কণ্ঠেও শোনা গেছে অনুরূপ প্রতিধ্বনি—যারা মানবাধিকারের প্রশ্ন তুলছে তারা সন্ত্রাসবাদকেই মদত দিচ্ছে।

পরিবেশ আইনকানুন—নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য

আলোচনার মূলকেন্দ্রে একবার ফিরে দেখা যায়। দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নই সুনিশ্চিত করতে পারে দেশে দেশে নাগরিকদের অধিকার এবং মানুষের অধিকার। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ক্ষেত্রে কর্তৃত্বকারীরা যাতে প্রকৃতি পরিবেশ ন্যায় ও স্বাধীনতার শত্রু অতিলোভী অতিভোগীদের কাছে আত্মসমর্পন না করে সেটা দেখাই প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য, তার মধ্যে দিয়েই অর্জিত হতে পারে অধিকার সমূহ—বর্তমান ও অনাগত মানুষের, জীব ও অজীব প্রকৃতির।

রবীন মজুমদার

বিধিবদ্ধ ঘোষণা

পত্রিকার নাম	:	বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী
প্রকাশনার ভাষা	:	বাংলা ও ইংরাজী
প্রকাশনার স্থান	:	P 252 লেক টাউন কোলকাতা-700 089
প্রকাশ কাল	:	ত্রৈমাসিক
প্রকাশকের নাম	:	রবীন মজুমদার
জাতি	:	ভারতীয়
ঠিকানা	:	কেমিক্যাল টেকনোলজি বিভাগ 92 এ. পি. সি. রোড কলকাতা-700 009
মুদ্রকের নাম, জাতি ঠিকানা	:	ঐ
সম্পাদকের নাম, জাতি ঠিকানা	:	ঐ
প্রেসের নাম ও ঠিকানা	:	ইটারনিটিপ্রেসের পক্ষে প্রিন্টিং পাবলিসিটি 117 কেশব সেন স্ট্রীট, কলকাতা-700 009

আমি, শ্রী রবীন মজুমদার, ঘোষণা করছি, যে উপরি-উক্ত বিবৃতি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্বাঃ রবীন মজুমদার

প্রকাশক : *বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী*

টালি নালা এবং 'ওরা' ও 'আমরা'

ভূমিকার বদলে

আমাদের এক বন্ধু প্রতক্ষ্যদর্শীর বর্ণনা

"তারপর বেশ কয়েকটুকরো ইট এসে পড়ল সেই সব মানুষদের ওপর যারা তাদের নিজবাসভূমি থেকে আর কিছুক্ষণপরেই উৎখাত হবে। উৎখাত করার সমস্ত আয়োজনই প্রস্তুত হয়ে আছে। বুলডেজার, পে-লোডার, সরকারী উচ্চপদস্থ আমলা, টি.ভি'র ঝা-ঝকঝকে সাংবাদিক। সশস্ত্রপুলিশ, সামরিক জংলাপোষাকে র‍্যাফ বাহিনী, ছিল যুদ্ধের সম্পূর্ণ চিত্র, কিন্তু মাত্র আধ ঘন্টার জন্য স্থগিত রাখা হয়েছিল এই সামরিক অভিযান, উচ্ছেদ হয়ে যাবে এরকম মানুষেরা প্রচুর অনুরোধ করে মাত্র আধঘন্টা এই উচ্ছেদ অভিযান স্থগিত রেখেছিল দুপুরের খাবারটা খেয়ে নেবে বলে। তারপর ওরা ভেসে যাবে কোন অনিশ্চিত অনিকেত অন্ধকারে, এই সব ক্ষুধার্ত মানুষেদের ঘিরে ছিল পুলিশ আর র‍্যাফের বৃত্ত, এই বৃত্তের বাইরে ভিড় করেছিল এইসব অঞ্চলের ভদ্রলোক আর ভদ্র মহিলারা। এই উচ্ছেদে সরকারের উৎসাহকে ছাপিয়ে যাচ্ছিল এই বে-সরকারী ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলাদের উৎসাহ। কেননা মেট্রোরেল সম্প্রসারিত হবে। এই আধঘন্টার বিরতিতে ঘটে গেল উদ্দীপনার হঠাৎ অভাব, এটাই ক্রমশ এই দর্শকদের বিরক্তির উদ্রেক করেছিল। তাই বেশ কিছু ইটের টুকরো এই ভিড় থেকে এসে পড়ে এইসব ক্ষুধার্ত হতভাগ্য মানুষদের উপর। ইটের টুকরোয় রক্তাক্ত চোখ আর সেই চোখ দিয়ে দেখে নিচ্ছিল তাদের অনেক অনেক দিনের ভদ্র প্রতিবেশীদের। তাদের সেই দৃষ্টিতে কি ছিল?"

আর এই বর্ণনাটাই এই রচনাটাকে সারাক্ষণ তাড়িত করে চলে।

'আইনী মানুষ বে-আইনী' মানুষ

রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সাধারণত যে উন্নয়নের উদ্যোগ চলে আসছে তাতে হিংসা প্রায় অবশ্যম্ভাবী উপাদান হয়ে উঠেছে। জাপানের এয়ারপোর্টের সম্প্রসারণ বা আমেরিকার এক্সপ্রেসওয়ের প্রসারণ; দেশীয় নর্মদা বাঁধ বা তেহরী বাঁধ যেখানেই হোক না কেন, রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের ঝকঝকে বিজ্ঞাপনের বাহুল্য সত্ত্বেও তার হিংস্র নিপীড়নকারী হাতটাকে গ্লাভস দিয়ে ঢেকে রাখতে পারছেনা। টালিনালার প্রায় চল্লিশ বছর ধরে বসবাসকারী মানুষদের উচ্ছেদের উদ্যোগে বামফ্রন্ট সরকার কোন ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেনি তবে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এইরকম এক ঘোষনার মধ্যদিয়ে যাতে বলা হয়েছে কিছুতেই এই উচ্ছেদ হওয়া মানুষগুলিকে পুনর্বাসন দেওয়া হবে না। রাষ্ট্রের নির্মম উলঙ্গরূপের এরকম স্বীকৃত প্রকাশ খুব কমই দেখা গেছে। উন্নয়ন কল্পে উচ্ছেদের কর্মসূচী থাকলে আন্তর্জাতিক লগ্নী সংস্থাগুলিও (যেমন World -Bank, ADB ইত্যাদি) যেখানে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতেই লাভ-লোকসানের হিসাব কষেই পুনর্বাসনের প্রকল্পকেঅন্যতম আবশ্যিক সত্যকরে তুলেছে সেখানে বামফ্রন্টীয় এই নির্মমতা হয়ত গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ইত্যাদি রাজ্যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে উৎসাহী করে তুলবে পুনর্বাসন ছাড়া উচ্ছেদ করতে। পুনর্বাসনের প্রস্তাবকে শুধু উপেক্ষা নয় এক ভয়ঙ্কর সন্ত্রাস নামিয়ে আনা হয়েছিল সমস্ত অঞ্চলে। উচ্ছেদের কয়েকদিন আগে থেকেই র‍্যাফ ও পুলিশের ফ্ল্যাগ মার্চ এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির আবহাওয়া গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। সরকার তারই দুর্বল, নিপীড়িত নাগরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই সমস্ত নাগরিকরা সরকারের সমস্ত চিহ্নের মধ্যে দিয়েই স্বীকৃতি পেয়ে আসছিল, তাদের নির্দিষ্ট ঠিকানা ছিল, ভোটার লিস্টে নাম ছিল, রেশন তোলার কার্ড ছিল। রাষ্ট্র এইসব স্বীকৃত নাগরিকদের জবরদখলকারী, হিসাবে চিহ্নিত করে চেষ্টা করল 'আইনী' জগত থেকে উচ্ছেদ করে অনিশ্চিত 'বে-আইনী' জগতে নির্বাসন দিতে। সরকারের সাথে নাগরিকদের সম্পর্কের একটিই সূত্র তা হল আইনের নানা ব্যাখ্যা, মানবিকতার কোন প্রশ্নই ওঠেনা, আইনের ব্যাখ্যায় যখন এইসব মানুষ বে-আইনী হিসাবে চিহ্নিত হয়ে যায় তখন তো দরকারই হয়ে পড়ে আইন-রক্ষকের। হাতে আগ্নেয়াস্ত্র, পরনে জংলা পোষাক,

মুখে যোদ্ধার নির্লিপ্ততা। 'বে-আইনী', জবরদখলকারীদের উচ্ছেদের দিন নির্দিষ্ট হয়ে যায় ২২শে সেপ্টেম্বর। ঝাঁপিয়ে পড়ল আইন-রক্ষকেরা। আইন-রক্ষার নেতৃত্বে 'উন্নত সংস্কৃতি মনস্ক বলে স্ব-ঘোষিত বাঙালী চেতনা জাগ্রত করার ব্রতে ব্রতী, জেলা শাসক মহাশয়। এই জেলা শাসক মহাশয়ের সামনেই অস্ত্রধারী আইনীরক্ষকেরা বৃদ্ধার মাথা ফাটিয়েছে, গৃহস্থের রান্নার হাড়িতে, বিছানায় প্রস্রাব করেছে। কুৎসিত গালাগালি দিয়েছে তাদের যারা প্রচুর হুমকি আর ভয় দেখান সত্ত্বেও ভিটে বাড়ি ছেড়ে যায়নি। আশেপাশের যে সব 'আইনী জবরদখলকারী' অর্থাৎ কলোনীর মানুষদের প্রবল উৎসাহে উদ্দীপনা, মুখ্যমন্ত্রী থেকে সবরকমের মন্ত্রীদের আত্মবিশ্বাসী ঘোষণা, বেশীরভাগ রাজনৈতিক দলগুলির শীতল নির্লিপ্ততা আর T.V. ক্যামেরার লঙ্ শট্, মিড শঠের মধ্যে দিয়ে বুলডোজার, পে-লোডারে ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে লাগল প্রায় অর্ধশতাব্দীর প্রাচীন এক মানব-বসতি। এই ব্যপ্ত শ্মশানের বুকে দাঁড়িয়ে আমরা একটু ভাবব কেন এমন হয়?

যেভাবে হয়

উন্নয়ন এমন একটি ধারণা যা মূলত প্রাতিষ্ঠানিক, সমাজের একদম ওপর থেকে নির্ধারিত হয় উন্নয়নের রণনীতিও রণকৌশল। নানা মাধ্যমে এই উন্নয়নের ভাবনা সাধারণের মধ্যে মান্যতা পেতে থাকে, প্রতিষ্ঠান সক্ষম হয় তার নিজের পক্ষে বেশ কিছু মানুষকে টেনে নিতে। এটা যেমন বেশ কিছু Elite মানুষদের ক্ষেত্রেও ঘটে আবার ঘটে বৃহত্তর, সংখ্যাগুরু নাগরিকদের ক্ষেত্রেও। এই সমাজের বৃহত্তর অংশ্ 'আমরা', সবসময়েই মনে করে 'আমাদের' স্বার্থে ক্ষুদ্রতর ওদের বিসর্জন নৈতিক, এই ক্ষুদ্রতর 'ওরা' কখনও হয় 'অ-সভ্য', কখন 'অ-সংস্কৃত', 'বে-আইনী', ইত্যাদি। 'ওরা সবই হল নেতিবাচক চিহ্নে চিহ্নিত, আমরা হলাম সভ্য, সংস্কৃত, আইনী— ইতিবাচক চিহ্নে চিহ্নিত'। 'আমরা আর' 'ওরার নির্মাণ বদলে বদলে যায় সমাজ, ভূগোল, ইতিহাস রাজনীতির নানা ছকে। নর্মদা বাঁধের ক্ষেত্রে ওরা হল মূলত আদিবাসী তাই আমরা হয় শহরের উচ্চ বিত্ত, উচ্চবর্ণ বাঁধের কন্ট্রাকটর বাঁহাতের কার্যে সিদ্ধ সমস্ত মাত্রার সরকারী কর্মচারী। টেহরী বাঁধের ক্ষেত্রে ওরা' ক্ষুদ্রতর অংশটুকু হলো গাড়োয়ালের পাহাড়ের সর্বস্তরের মানুষেরা আর আমরা হল সমতলের ঝাঁ ঝকঝকে শহরগুলির ভোগী জনগোষ্ঠী। এক জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে স্থির হতে থাকে কোন বৃহত্তর অংশের ভোগের জন্য কোন ক্ষুদ্রতর অংশের বলিদান আবশ্যিক। পঃবঙ্গের বিশেষ করে কলকাতা শহরের উন্নয়নের ঢাক যখন প্রবলভাবে বাজছে তখন এই নির্মাণ আর নির্ণয়ের জটিল ছকটাকে আমাদের একটু বুঝে নেওয়া দরকার।

বঙ্গীয় ছক

স্বাধীনতার পর পঃবঙ্গে কংগ্রেস গণভিত্তি গড়ে তুলেছিল তার স্বাধীনতা আন্দোলনে বিতর্কিত ভূমিকা সত্ত্বেও। স্বাধীনতা আন্দোলনে কম্যুনিষ্ট পার্টির ভূমিকা বিশেষ করে 42 -এর আন্দোলনের ভূমিকা মূলত মধ্যবিত্ত মানুষের থেকে এই দলটিকে প্রায় বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল, এই বিচ্ছিন্নতা আরও প্রবল হয়েছিল নেতাজী সম্পর্কিত পরবর্তী মনোভাবে। এই বিচ্ছিন্নতা ক্রমশই বিলুপ্ত হচ্ছিল ;স্বাধীনত্তোর সরকারী কংগ্রেস দলের জন-বিরোধী নানা ভূমিকা, সরকারী উদ্বাস্তুনীতি সাহায্য করল কম্যুনিষ্ট পার্টিকে আবার সাধারণ মানুষের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে। উদ্বাস্তুদের নিয়ে আন্দোলন উদ্বাস্তুদের ওপর গড়ে তুলল এক অনির্ণেয় প্রভাব।

দেশ বিভাগের ঠিক পরবর্তী সময়গুলিতে যারা উদ্বাস্তু হয়ে এই বঙ্গে এসে পড়েছিলেন তাদের মধ্যে উচ্চবর্ণের সংখ্যাই বেশী ছিল। উদ্বাস্তু আন্দোলনের ফলে এরাই মূলত কলকাতা শহরের উপকণ্ঠে বিভিন্ন জমির মালিকের জমি, সরকারের খাস জমি দখল করে কলোনী অঞ্চলগুলি গড়ে তোলে। এই উদ্বাস্তু আন্দোলন কংগ্রেস বিরোধী সমস্ত রকম দল, ডান, বাম নির্বিশেষে, সবাইকে নিয়েই গড়ে উঠেছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত দখল করে নেয় কম্যুনিষ্ট পার্টি। এই দখল মানে শক্তি প্রয়োগ কখনই নয়। এই দখল মানে একটা বোঝাপড়া, সেই সময়কার উদ্বাস্তুদের মধ্যে উচ্চবর্ণ হিন্দু, প্রাক্তন জমির মালিকদের নিয়ে কলোনী অঞ্চলগুলিতে যে জনগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল তাদের মানসিকতার সাথে কম্যুনিষ্ট পার্টি খুব দ্রুত বোঝাপড়া করে নিতে সক্ষম হল। কলোনী অঞ্চলগুলিতে গড়ে উঠল এই দলের দুর্বার সংগঠন। কম্যুনিষ্ট পার্টির নানান গণ সংগঠনের নেতৃত্বে এই উদ্বাস্তু Elite রা দ্রুত উঠে এল। কলকাতা শহরের আন্দোলনগুলি প্রায় তাই এদের এজেন্ডাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। এদের চাকরীস্থান থেকে বাসস্থান উন্নয়নের দাবী কলকাতা শহরকে অনেকবারই আলোড়িত করে তুলেছিল। শ্রমিকের বস্তী, নিম্নবর্ণদের বস্তীর উন্নয়ন প্রায় কখনই এদের এজেন্ডা হয়ে ওঠেনি। এই মধ্যবিত্তেরা, উচ্চবর্ণের বাঙালী হিন্দুরা ভারতীয় অর্থনীতির আর্থিক নীতিতে কিছুটা ফুলে ফেঁপে উঠছিল, বিশেষ করে সরকারী বেসরকারী সংস্থার চাকুরীরত কর্মচারীরা। এই কিছুটা ফাঁপা টাকা এবার দাবী করতে লাগল আরেকটু ভালোভাবে

থাকা, ভালোভাবে যাতায়াত করা আরো বেশী নাগরিক স্বচ্ছলতা, একটু বেশী আরামে থাকা। কলকাতার মতন একটা প্রাচীন শহর তার ভাঙাচোরা সরু সরু রাস্তা, প্রায় সমস্ত নাগরিক সুবিধার ভঙ্গুর অবস্থার মধ্যে মধ্যবিত্তের এই ভোগ আকাঙ্খাকে চরিতার্থ করতে অক্ষম হয়ে পড়েছিল। সরকারও কোন উদ্যোগ নেয়নি যাতে এই শহরটায় আরো একটু ভালভাবে থাকা যায়, তাই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল এমন কিছু জায়গা যা মধ্যবিত্তের এই আকাঙ্খাকে চরিতার্থ করতে পারবে। কলকাতার পূর্বদিকের দিগন্ত বিস্তৃত জলাশয় কে তাই বোজাতে হল। অঞ্চলটির প্রাচীন নাম লবন হ্রদ হলেও ইংরেজী ভাষায় এই নামের রূপান্তর Salt lake city চিহ্নিত করল আমাদের আগামী উন্নয়নের লক্ষ্য আর ভবিতব্যকে। এই বিশাল জলাশয়ে ছিল এক প্রাচীন মৎসজীবী সমাজ, ছিল তাদের এক বৃহৎ সমবায় কিন্তু Salt lake এর শুকানো বালিতে শুকিয়ে গেল এইসব নিম্নবর্ণের মৎসজীবীদের জীবন, জীবিকা। কোথায় হারিয়ে গেল এরা কলকাতার বাবু সমাজ তার খোঁজ ও নেয়নি। কোন রাজনৈতিক দলই মধ্যবিত্তের সাথে বোঝাপড়াকে ভাঙতে চায়নি। শহরের elite অংশের আকাঙ্খার বিরোধীতার মধ্যে (আমাদের নির্বাচন কেন্দ্রীক মূলত : elite মানুষদের আকাঙ্খা কেন্দ্রীক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে) যে কিছুটা ভীতি থেকে যায় সেই ভীতি কাটিয়ে নিম্নবর্ণ মানুষদের দুঃখের সাথী হবার সাহস কেউ দেখাতেই পারেনি। এমনকি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচন ছাড়াও যে আরেকটি স্তম্ভ থেকে যায় সেই মিডিয়াও এই নব্যবাবুদের আকাঙ্খায় মদত দিয়েছে। এই মিডিয়ার বাজার এই নব্যবাবুদের রুচি কেন্দ্রীক, বাজারে টিকে থাকার প্রবণতাতেই মিডিয়া ব্ল্যাক আউট করে দিয়েছে শহরের উপকণ্ঠে থাকা এই নিম্নবর্ণ, নিম্নআয়ের সংখ্যালঘুদের কান্নাকে। 60 দশকে এই Salt Lake নির্মানের মধ্যদিয়ে কলকাতার উন্নয়নের যে 'ওরা' আর 'আমরা' নির্মাণ হয়ে গেল সেই নির্মিত ভিত দৃঢ় থেকে আর ও দৃঢ়তর হয়েছে মধ্যবিত্তের আকাঙ্খা যত বেড়েছে। শহর বাড়িয়েছে তার প্রান্তসীমা, প্রান্তসীমা ক্রমেই প্রসারিত হয়েছে, প্রান্তিক মানুষ ততই বিপন্ন হয়েছে। এই বিপন্নতা, এই অ-মানবিকতা কোনদিনই আন্দোলনের এজেন্ডা হয়ে উঠতে পারল না নাগরিকদের বৃহত্তর সমাজে।

এই যে উন্নয়নের বর্গীকরণের ক্রিয়া শুধুমাত্র পঃ বাংলায় বৈশিষ্ট্য এমন নয়। সমাজে অর্থনীতি রাজনীতি সমস্ত দিক দিয়ে এগিয়ে আসার আকাঙ্খায় তাড়িত যে মধ্যবিত্ত সমাজ তা প্রায় বিশ্বের সমস্ত উন্নয়নকেই প্রভাবিত করে চলে। মধ্যবিত্তের আঁকা এই লক্ষণের গন্ডীকে কোন রাজনৈতিক দলই অতিক্রম করতে পারে না। ডান, বাম নির্বিশেষে সবদলেরই এই একই মনস্তাত্বিক অবস্থান।

মানবতার নানান অর্থ

তবে পঃবঙ্গের বৈশিষ্ট্য ও আছে, এখানে এই মধ্যবিত্ত সমাজের সাথে সবচেয়ে বেশী বোঝাপড়া যেহেতু কম্যুনিষ্ট পার্টিরই হয়েছে তাই কিছু বিচিত্র জিনিস আমরা লক্ষ্য করি। কম্যুনিস্ট পার্টি বলতে অবিভক্ত কম্যুনিষ্ট পার্টি (C.P.I.) । বিভাজনের পর মূলত C.P.I.(M)। বামফ্রন্ট প্রতিষ্ঠার পর মরিচঝাপিতে সুদুর মধ্যপ্রদেশ থেকে উদ্বাস্তুরা, উদ্বাস্তু আন্দোলনে বামপন্থীদের পুরনো ভূমিকাকে মনে রেখে, চলে এসেছিল এই জঙ্গালাকীর্ণ সুন্দর বনের দুর্গম দ্বীপে। এইসব নিম্নবর্ণের মানুষেরা নিজের শ্রমে গড়ে তুলছিল জনবসতি। বামফ্রন্ট মনে করল এ তার অস্তিত্বে কাঁটা, তার ছকা উন্নয়নের ব্লু-প্রিন্ট বহির্ভূত। এই উন্নয়ন যা নিম্নবর্ণ উদ্বাস্তদের আকাঙ্খাকে পূরণ করতে যাচ্ছিল তাকে বামফ্রন্ট বে-আইনী ঘোষণা করল। এক অ-মানবিক সন্ত্রাস নামিয়ে আনল নিম্নবর্ণমানুষদের ওপর। পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ করে, পুলিশী অত্যাচার নামিয়ে এনে এদের বাধ্য করা হল দ্বীপ ছাড়তে। এই সরকারী দমননীতিকে কলকাতার বাবুসমাজ স্বীকৃতি দিয়েছিল, কলকাতার মধ্যবিত্তের স্বার্থকে যেহেতু পরিপুষ্ট করে না এই নিম্নবর্ণদের একটু ভালোভাবে বাঁচার বে-সরকারী প্রচেষ্টা, তাই মধ্যবিত্ত বাবু সমাজ সরকারী দমন কে সমর্থন জানিয়েছিল। কিছু মানবাধিকার সংগঠন গান্ধীবাদী ছোট ছোট সংগঠন, র‍্যাডিকাল হিউমানিস্ট এবং ক্ষুদ্র নকশালপন্থী দলগুলি ছাড়া এই বর্বরতার বিরোধ কেউ করেনি। টালিনালা উচ্ছেদে তৃণমূল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাৎপসারণ করে, SUCI অনেকটা এগিয়েও পিছিয়ে যায়। কোথাও তাই বিরোধ দেখা যায়নি। 4 নম্বর পোল সম্প্রসারণ, মেট্রোপলিটন বাইপাস্ নির্মান, নানা প্রমোদের জায়গা নির্মান করতে উচ্ছেদ হয়ে গেছে প্রান্তিক মানুষ কিন্তু কম্যুনিষ্ট পার্টি সহ রাজনৈতিক দলগুলি মধ্যবিত্তের সাথে সমীকরণে এই উচ্ছেদে মদত দিয়েছে। হকার উচ্ছেদে একই চিত্র।

অথচ কম্যুনিস্ট পার্টি (মা) ঘোষিত ভাবে নিপীড়িত মানুষদের, তাকে এই ঘোষণা প্রমাণ করার দায়ও থাকে। তাই এই দলের ডাকে এখানকার মধ্যবিত্ত সুদূর অঞ্চলের অজানা হতভাগ্য মানুষদের ওপর বর্বরতার বিরুদ্ধে এই শহরে লড়াই করেছে, মিছিল করেছে। ভিয়েৎনামের নিপীড়িত মানুষ, চিলির অত্যাচারিত মানুষ, নিকারাগুয়ায় খেটে খাওয়া মানুষদের

নিজেদের আকাঙ্খা পূরণ করার লড়াই তার ভোগ আকাঙ্খাকে কোথাও সরাসরি বাঁধা দেয়না। তাই টালিনালায় হতভাগ্য মানুষদের উচ্ছেদ করেই তার দু' দিনপরেই একই মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি আফগানিস্থানে আমেরিকার বোমায় গৃহহারা মানুষের সমর্থনে 'মহামিছিলে' সামিল হয়েছে। এই দ্বি-চারিতা টুকুই শুধু পঃ বাংলার বৈশিষ্ট্য। হয়ত নিজের অঞ্চলের নিপীড়িত মানুষের বিরোধীতার গ্লানি মুছে নিতে চেয়েছে সুদূর অঞ্চলের মানুষের সমর্থনে দাঁড়িয়ে যে মহত্বের আত্মতৃপ্তি তা দিয়ে। টালিনালা নিয়ে বেশ কিছু পরিবেশবাদী সংগঠন এই শহরে সেমিনার ইত্যাদি করেছিল। টালিনালার মানুষের জলপ্রবাহ কি করে পরিচ্ছন্ন করা যায় এই বিষয়টিই প্রাধান্যপায়, এদের বক্তব্য ছিল মেট্রোরেল সম্প্রসারণে টালিনালা নষ্ট হয়ে যাবে। টালিনালা বন্ধ হয়ে গেলে একটা ইতিহাস মুছে যাবে, কলকাতার দক্ষিণতম অংশে নর্দমার জল পরিস্কার হতে পারবেনা, জল মগ্ন হয়ে যাবে। মেট্রোরেল সম্প্রসারণে মধ্যবিত্ত মানুষের যে আকাঙ্খা জেগে উঠেছে তার সরকারী উদ্যোগকে এরা বাধা দিচ্ছিল। কিন্তু এদের এই আলোচনায় এখানকার মানুষদের প্রান্তিক মানুষরা এলেও এসেছে সমস্যা হিসাবে, পুনর্বাসনের কোন প্রস্তাবও ছিল না এদের। আমাদের স্মরণ আছে হকার উচ্ছেদকে কিছু পরিবেশবাদী সমর্থন জানিয়েছিল। এই সমর্থনগুলি এই সরকারী আক্রমনকে যুক্তিসম্মত করে তোলে।

ভূমিকা যখন বদলে যায়

একটা সর্বাত্মক ঐক্যমতের মধ্যে মধ্যবিত্ত সমাজ, রাজনৈতিক দলগুলি এমনকি কিছু বিকল্প সংগঠনও এই উন্নয়নের রাজনৈতিক নির্মাণ ঘটিয়ে চলেছে, এই প্রক্রিয়া এখনও তেজী সেটা বোঝা যায় টালিনালার উচ্ছেদের পর সরকারী উদ্যোগে বেলেঘাটারখাল, রেলের হকার ফুটপাতের হকার, আরো আরো উচ্ছেদের প্রস্তাব ঘোষিত হয়েছে। শহরকে সুন্দর করতে হবে ডাইনিং রুমে রঙীন টি ভি তে কেবল লাইনে ভেসে আসা সুদূরে হংকং শহরের মতন বা নিউ ইয়র্ক এর মতন। মধ্যবিত্তের এই স্বপ্নের কারিগর এখন বামফ্রন্ট, তার শক্তি এই উচ্চবর্ণের বাঙালী হিন্দু যাদের বেশী ভাগই নিজের দেশ থেকে উচ্ছেদ হয়ে এসে এখানে জবরদখল করে থেকেছে। এখন তারাই 'জবরদখলকারী' উচ্ছেদের সক্রিয় সমর্থক। একটু কি মনে পরে যাচ্ছে ইজরাইলের কথা। শতাব্দীর পর শতাব্দী ইহুদীদের ওপর অত্যাচার তাকে গৃহহারা করেছে। তারাই যখন নিজভূমি ফিরে পায় সেই ভূমি সম্প্রসারণে এই ইহুদীরাই উচ্ছেদ করে চলেছে ওখানকার ভূমিপুত্রদের।

একটা অসম্ভব চেষ্টা

একটা ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাও চলছে এই লক্ষণের গণ্ডী ভাঙ্গার। কিছু ক্ষুদ্র দল, দলহীন সংগঠন, সংগঠনহীন কিছু মানুষ এসে দাঁড়াচ্ছে এই প্রান্তিক মানুষদের পাশে। এক অসম্ভব প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এদের সমর্থনে বৃহত্তর মানুষকে সামিল করতে। এই আন্দোলনে, প্রচেষ্টার মধ্যে অনেক গণ্ডগোল আছে, অনেক সমস্যা আছে তবুও হয়ত, এই ভাবেই শুরু হয়।

উপসংহারের বদলে

এই লেখাটার মধ্যে কোথাও যদি এরকম মনে হয় একটা বিশেষ শ্রেণী মধ্যবিত্তের, (যে শ্রেণীটি সেই অর্থে শাসক শ্রেণীও নয়) আকাঙ্খাই পরিচালিত করে চলেছে আজকের 'উন্নয়ণে'র কর্মসূচীকে, তাহলে ভুল সংকেত পৌছাবে পাঠকদের কাছে। এই লেখাটির মধ্যে দিয়ে চেষ্টা করা হয়েছে শাসক শ্রেণী তার কর্মসূচীতে কি ভাবে অ-শাসক শ্রেণীকে অর্ন্তভুক্ত করে নেয়, তা দেখা বার। উন্নয়নের বিস্তৃত কর্মসূচীতে মধ্যবিত্তের নাভিশ্বাস উঠছে, তার স্থায়ী চাকরীর জায়গা, স্বাস্থ্য পরিসেবার ব্যবস্থা, সন্তানকে শিক্ষা দেবার স্থান সব কিছুই আক্রান্ত পুঁজিবাদী আক্রমণে। অথচ আমার এক প্রতক্ষ্যদর্শী বন্ধুর বর্ণনার মতন ঘটনা ঘটেই চলছে। উপসংহারের বদলে তাই একটি নীতিকথা "ব্যবসায়ীরা গরুর মাংস বহন করায় গরুর গাড়িতেই"।

কাজল মুখার্জী

‘মানসিক অসুস্থতা’ কিংবদন্তী ও অমানবিক ‘মনোচিকিৎসা’

স্বরূপ ও শিকার

সৌমেন গুহ

সমালোচনা-পর্যালোচনা ছাড়া বিজ্ঞান বিজ্ঞান হয়ে ওঠে না। আর যারা পেশাগতভাবে সেই বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করেন, তারা যদি সমালোচনা-পর্যালোচনায় উদাসীন হন, তাহলে বিজ্ঞান জ্ঞানের আলোক তো দেবেই না— দিনের আলোও ঢেকে দেবে অন্ধকারে। আশা করছি নীচের রচনাটি বিতর্ক ও আলোচনার জন্ম দেবে।

—স: ম:

[লেখকের কৈফিয়ৎ : একান্ত ব্যক্তিগত ধারণায়, যে কোনো মানসিক বিপর্যয়কে আমি সমস্ত ধরণের অসুস্থতার মধ্যে সব থেকে বিপজ্জনক এবং গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। মানসিক কোনো বিপর্যয়ের তথাকথিত চিকিৎসা—ক্যান্সার, ওপেন্ হার্ট সার্জারি বা কিড্‌নি ট্রান্সপ্লান্টেশনের থেকে, অনেক কঠিন সমস্যা বলে মনে করি। এ ব্যাপারে কোনো সামান্য দায়িত্বহীনতাও বিরাট ক্ষতি করতে পারে একজন মানুষের জীবনে—যদিও হয়তো সে শারীরিকভাবে বেঁচে থাকবে বেশ কিছুকাল। এই ব্যক্তিগত ধারণাটি মূলত এ লেখার প্রেরণা। বর্তমান নিবন্ধে তাই খুব সতর্ক থাকার চেষ্টা করেছি, তথ্য ও বিশ্লেষণের ব্যাপারে। এটা করতে গিয়ে, চিকিৎসা-সংক্রান্ত তথ্যের সমস্ত সূত্র হিসেবে প্রধানত নির্বাচন করেছি, পেশাগতভাবে প্রতিষ্ঠিত (কারো কারো ভাষায় ‘বিশ্ববিখ্যাত’) মনোচিকিৎসক ও মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের লিখিত রচনাবলী। আর তার সাথে, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই, প্রায়শই মনোচিকিৎসক ও মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের সংক্ষিপ্ত পরিচয় বা পেশাগত ও প্রাতিষ্ঠানিক যোগ্যতার আভাস দিয়েছি—শুধুমাত্র তাঁদের বক্তব্যের পেশাগত ও প্রাতিষ্ঠানিক গুরুত্ব বোঝানোর জন্য। মানবিক অধিকারের প্রসঙ্গটিতেও, সাধারণত বিশদ গবেষণাগুলিকে ব্যবহার করেছি। ফলে, সমগ্র লেখাটিতে বহু সুন্দর গুরুত্বপূর্ণ রচনার উল্লেখ করা হয়নি, যেগুলি আপাতভাবে ‘পেশাদার’ নয়। যে কোনো তথ্য বা মতামত, নিবন্ধের মধ্যে বাংলায় সংক্ষেপে উল্লেখ করার সাথে সাথে, মূল (ইংরেজি) বয়ান নির্দেশিকায় উদ্ধৃত করেছি, তথ্যকে নির্ভরযোগ্য করার জন্য। অবশ্যই বাদ পড়েছে, আমার নিজের অভিজ্ঞতার তথ্য। বিদেশ নয়—এই বাংলা বা কলকাতার বুকেই, মনোচিকিৎসার নামে আমাদের ঘনিষ্ঠ ও দূরবর্তী, চিকিৎসক ও সংগঠন, অনেক অনাচার অন্যায় অপরাধ করেছে ও করছে, যার তথ্য দিয়ে এ নিবন্ধকে আরো ভারাক্রান্ত করা যেতো। কিন্তু এই বিরাট তথ্যভান্ডারকে সংক্ষেপে সারলে, অন্যায়ের প্রতিকারের বদলে, ভাসাভাসা কথার সুযোগ বাড়তো—অথচ যাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে, তারা থাকে সেই তিমিরেই। যেমন বাদ গেছে, মনোচিকিৎসার নিছক ব্যবসায়ী দিকের আলোচনা। আমার মতো তুচ্ছ লোকের কোনো মতামত এ নিবন্ধে গুরুত্ব স্থান পায়নি—কিন্তু কয়েকটি ওষুধের প্রতিক্রিয়ার ও তথাকথিত ‘মনোচিকিৎসা’-র প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমার নিজেরই আছে। যেমন, 1971-72 সালের এক দুর্যোগময় সময়কালে, একাধিক প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসকের ‘রোগনির্ণয়’ অনুযায়ী, কঠিন ‘মিগ্রেইন্’ ‘রোগাক্রান্ত’ হিসাবে টফ্রানিল্, স্টেমেটিল্ ইত্যাদি, মূলত এক ধরণের মনোচিকিৎসার ওষুধ খাওয়ার পরামর্শ সত্ত্বেও, ওষুধ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলাম—যেহেতু চিকিৎসার প্রবল প্রতিকূল মন ও পরিবেশ ছিল। পরিণতিতে, চিকিৎসায় ‘দুরারোগ্য’ মিগ্রেইন্ কিছু বছর পরে বিনা চিকিৎসায় ও বিনা ওষুধে সম্পূর্ণ সেরে গেছে! আমাকে ‘মানসিক অসুস্থ’ বা ‘মানসিক রোগগ্রস্ত’ ঘোষণা করে, 1996 সালে কলকাতায় সাংবাদিক বৈঠক হয়েছে, প্রগতিশীল ও বাণিজ্যিক পত্রিকা উভয়ই সেটা ফলাও করে ছাপিয়েছে। আমার পরম বন্ধু আর চরম শত্রু, উভয়েই আমাকে হুবহু একই ঘটনা ও কারণে—‘মানসিক অসুস্থ’ বা ‘পাগল’ বলেছে। আর 2000 সালে, এক মর্মান্তিক দুর্যোগে, আমাকে ‘মনোচিকিৎসা’র ওষুধ কড়া মাত্রায় খেতে হয়েছিলো। সমস্ত ঘটনার পুরো বিবরণ এক ভয়ঙ্কর আর মর্মান্তিক দুঃস্বপ্নের মতো, নানা কারণে বলছি না। কিছু মাস পর, চিকিৎসকের নির্দেশ, পরামর্শ ও সাবধানবাণীর সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে, সমস্ত ওষুধ খাওয়া নিজের দায়িত্ব ও সিদ্ধান্তে বন্ধ করে দিই—নিজেকে ও পরিবারকে বাঁচাবার জন্যে। যার অনিবার্য পরিণতি হলো—ওষুধ খাওয়ার চেয়ে, আমি এখন অনেক অনেক ‘ভালো’ আছি, অবশ্যই আমার নিজের জীবনচর্যায়, নিজের মতো করে—এ জাতের বা এ ধরনের ওষুধ, এমন কি ‘অল্পমাত্রার’ সাধারণ ঘুমের ওষুধও, একেবারে খাই না, ‘মনোচিকিৎসার’ ফাঁস থেকে বেরিয়ে এসে। এই সব অভিজ্ঞতায়—‘মনোরোগ’ বা মনোচিকিৎসার চলতি সংস্কৃতিকে, অত্যন্ত হিংস্র ও সর্বৈব ক্লেদাক্ত এক বিপজ্জনক সামাজিক সংক্রামক ব্যাধি হিসেবেই দেখেছি—শত্রু ও মিত্রের কোনো তফাৎ নেই এ অস্ত্রে, নিজের অস্তিত্ব বাঁচাতে। এ ছাড়াও, কিছু মনোচিকিৎসা ও তার সংগঠন, আর কয়েকজন চিকিৎসককে খুব কাছ থেকে দেখেছি দীর্ঘ দিন, নানা সূত্রে। তার সাথে যৎকিঞ্চিৎ পড়াশোনা। এ লেখারপুঁজির হিসেব অনেকটা এ রকমই। এটা বলা দরকার যে, নির্দেশিকায় উদ্ধৃত সমস্ত প্রবন্ধ ও গ্রন্থের প্রতিটি অংশের জেরক্স-কপি, যাঁরা গভীরভাবে জানতে চান, শুধুমাত্র কপি করার খরচে সংগ্রহ করতে পারেন নির্দ্বিধায়—যা দায়িত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, কথাবার্তা ও কাজকর্মের জন্য একান্ত জরুরী।]

উৎসর্গ

আমার হাওড়ার দেশবন্ধু বিদ্যালয়ের ছাত্রজীবনে, ছিন্নমূল বাস্তুহারা এক বিজ্ঞানের মাস্টারমশাই, মনোরঞ্জনবাবু-স্যারকে মনে করে.......যাঁর মৃত্যুর কিছু বছর আগে জিহ্বা আড়ষ্ট হলে, সম্পূর্ণ আশ্রয়হীন অন্নহীন বস্ত্রহীন যাঁকে, ‘পাগল’ বলে রাস্তায় ‘সভ্য-সুস্থ-মানুষেরা’ খ্যাপাতো, পরণের এক টুকরো ছিন্ন কাপড় টেনে খুলে দিতো, ঢিল ছুঁড়তো, থুতু দিতো ....যিনি একদিন অনশনক্লিষ্ট অর্ধনগ্ন রক্তাক্ত দেহে, আমাকে না চিনে বলেছিলেন—‘দেখুন না, ওরা আমাকে মারছে’.......যাঁর শেষ জীবন চলতো, আমাদের ‘অনাথভাণ্ডার’-এর মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহের যৎসামান্য সাহায্যে.......যাঁর শিক্ষকতার জীবন, আমার কৈশোরে

প্রথাগত বিজ্ঞান শিখতে সাহায্য করেছে.......যাঁর লাঞ্ছিত নির্যাতিত শেষ জীবন, আমার কৈশোরে এই অমানবিক হিংস্র ক্লেদাক্ত পৃথিবীটাকে স্পষ্টভাবে চিনতে অপরিসীম সাহায্য করেছে.......যাঁর মৃত্যু ছিলো আমার একান্ত বাঞ্ছিত, আমার আন্তরিক কাম্য, আমার গভীর শান্তি ....

সেই স্মৃতিতে..............

মনোচিকিৎসা-মঙ্গল

'চিকিৎসার সফলতার হিসেবে—মনোচিকিৎসক ও মনঃসমীক্ষকরা সর্ব প্রকার হাতুড়ে, তুক্‌তাক্, ঝাড়ফুঁকের ওঝাদের থেকে নিশ্চিতভাবে নিকৃষ্ট।'—বলেছেন জার্মানির সাইকোপ্যাথলজির বিখ্যাত গ্রন্থ-প্রণেতা কে.জ্যাস্পার (1948), সমসাময়িক গবেষকদের মতে, যিনি আধুনিক মনোচিকিৎসকদের মধ্যে, সম্ভবত সব থেকে সূক্ষ্মাভিজ্ঞ ও জ্ঞানী।[1]

'শাসকরা সব যুগে শাসিতদের দাস বানানোর জন্যে চক্রান্ত করে। এটা করতে তারা বল আর প্রতারণার আশ্রয় নেয়। অতীতে এদের অত্যাচারকে মদত দিতে ছিলো ধর্ম, আর এখন রয়েছে চিকিৎসা। অত্যাচারীরা অত্যাচারিতদের, মুখ ফুটে কষ্টের কথা বলার শব্দাবলী কেড়ে নেয়। মানসিক-বিকারগ্রস্ততার নীতি নিখুঁতভাবে এখন ঠিক এই কাজটিতেই সফল হয়েছে।'—বলেছেন আমেরিকার মনোচিকিৎসক টমাস্ সাজ্।[2]

'অ-পেশাদাররা কেমন করে পেশাদারদের সরাসরি হারিয়ে দেয়? দু'টো পরিষ্কার কারণ আছে—অ-পেশাদারদের অনেক বেশি ভালোবাসা আছে। পেশাদাররা চিকিৎসা করে এক বিষাক্ত দল নিয়ে।'—বলেছেন সুইডেনের চিকিৎসক লার্স্ মর্টেন্সন্, 1984 সালে ডেনমার্কে অনুষ্ঠিত 'মানসিক অসুস্থদের নাগরিক অধিকার' বিষয়ে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে।[3]

'মনোচিকিৎসা বড়ো জোর ব্যবহারিক শিল্পকলা, কিন্তু এটা কখনোই কার্য-কারণের নিয়ম প্রয়োগকারী বিজ্ঞান নয়। মানবিক আচার-আচরণের অস্তিত্বহীন নিয়মাবলীর স্বচ্ছ পোযাক-পরা সম্রাটের কিংবদন্তী থেকে, আমাদের নিজেদেরকে মুক্ত করতে হবে।'—বলেছেন দর্শনশাস্ত্রের শিক্ষক রাজিয়েল্ অ্যাবেল্সন্, মনোচিকিৎসক টমাস্ সাজ্‌কে সমালোচনা করে।[4]

'মানসিক অসুস্থদের জন্যে বিশেষ আইনের বদলে—পারিপার্শ্বিকের কাছে বিপজ্জনক হিসেবে, জেনারেল, রাজনীতি-কর্মী, কিছু ক্ষেত্রে মনোচিকিৎসকদের হাজতে আটকানোর জন্যে বিশেষ আইন তৈরী করাটা কাজের কাজ।'—বলেছেন ডেনমার্কের 'ম্যাড় পিপল্স্ মুভ্‌মেন্ট' আন্দোলনের ক্লুড় টম্সেন, 1984 সালে ডেনমার্কে অনুষ্ঠিত 'মানসিক অসুস্থদের নাগরিক অধিকার' বিষয়ক সম্মেলনে।[5]

'আমার মতে, শ্রেষ্ঠ সার্বিক সমাধান হলো—নেদারল্যান্ডে, ইউরোপে, সারা বিশ্বে মনোচিকিৎসার প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিষিদ্ধ করা।'—বলেছেন নেদারল্যান্ডের মনোচিকিৎসাধীনদের অধিকার রক্ষার কর্মী হ্যান্স্ ভিগ্যান্ট্।[6]

আমেরিকায় মনোচিকিৎসার বিরুদ্ধে যুদ্ধের স্বাদ

তখন 1966 সাল। আমেরিকার বিখ্যাত 'দ্য অ্যাট্‌ল্যান্টিক্' পত্রিকার জুন মাসের সংখ্যার আশ্চর্য এক প্রচ্ছদ-কাহিনী পড়ে, হতবাক হয়ে গেলাম—'Psychiatrists Under Attack: The Rebellious Dr. Szasz' নিবন্ধের শিরোনাম,[7] লেখক এড্‌ডুইন্ এম. শুর্ (Edwin M. Schur), সমাজতত্ত্ব ও আইনে শিক্ষিত, পেশায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। দীর্ঘ এ নিবন্ধ শুরু হয়েছে একটি বিবরণে—1964 সালে আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশনের 120-তম বার্ষিক সভায়, মনোচিকিৎসক হেন্‌রি ডেভিড্‌সন্ 'মনোচিকিৎসার বিরুদ্ধে নতুন যুদ্ধ' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন—প্রবন্ধে তাঁর বিষয় ছিলো, মনোচিকিৎসক টমাস্ সাজের রচনায় মনোচিকিৎসার তীব্র সমালোচনা প্রসঙ্গে আলোচনা। এড্‌ডুইন্ শুর্ তাঁর নিবন্ধের শেষে, এটা অন্তত স্বীকার করে নিয়েছেন—'মনোচিকিৎসাকে, তার 'রোগীদের' নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে নৈতিক দ্বন্দ্ব আর সামাজিক সম্পর্কের কথা স্বীকার করে নিতে বাধ্য করে, সাজ্ এক গুরুতর কাজ করেছেন। সাজ্ যে কোনো লোকের থেকে বেশি কাজ করেছেন, আমেরিকার মানুষকে অত্যধিক মনোচিকিৎসা-কবলিত সমাজের বাস্তব বিপদ সম্পর্কে সাবধান করে।'[8]

নিবন্ধটি পড়ে টমাস্ সাজ্‌কে খুঁজছিলাম। খুঁজে পেতে দেরি হয়েছে, আর প্রথম পাঠে ঠিক বুঝে ওঠার, গ্রহণ করার বুনিয়াদের অভাব ছিলো নিজের মধ্যে। অবশেষে—'মানসিক অসুস্থতার কিংবদন্তী' (Myth of Mental Illness) কথাটা প্রথম পেয়েছি, টমাস্ সাজের রচনায়। সে তখন এক অস্থির সময়। সব সময়ই, অস্থির। কিন্তু 1960 থেকে 1970 সালের মধ্যবর্তী পৃথিবীর ও আমার বয়সের, বহু সমাজ-রাজনীতিক ধারণার সাথে সাথে, চিন্তা-ভাবনার বহু শাখাই পুনর্বিশ্লেষণ, পুনর্গঠন, ভাঙচুর করতে হয়েছিলো, অবিশ্রান্ত রাজরোষ-জনরোষ-যুদ্ধ-বিগ্রহের পরিবেশে। পুনর্বিশ্লেষণ, পুনর্গঠন, ভাঙচুর করতে হয়েছিলো, মানুষের মন নিয়ে বিজ্ঞানের নামে অজ্ঞতা, অগভীরতা, অত্যাচার, যথেচ্ছাচার, ব্যভিচার, অনাচারকে—মনস্তত্ত্ব (Psychology) আর

মনোচিকিৎসা (Psychiatry) চর্চার তার আগের পঞ্চাশ-ষাট বছরের জরাজীর্ণ অস্তিত্বকে। আশ্চর্য—আশ্চর্য তার তাজা বাতাস আমাদের দেশ বা মনস্কতায় কোনো নাড়া দিলো না, ছাপ ফেললো না। মনোচিকিৎসায় যুদ্ধের খবরটুকু আলোচিত হলো না, আলোচনা করতে দেওয়া হলো না।

ফ্রান্সে ছাত্রদের মনস্তত্ত্ববিরোধী আন্দোলন 1968

1968 সালের সময়কালে, তাকিয়ে থাকতাম আমেরিকা বা ফ্রান্সে, বা দেশে দেশে যুব-ছাত্রদের আন্দোলনের দিকে—টাটকা বাতাসে বুকটা ভরে যেতো। এমন একটা ধারণা খুব চালু আছে যে—সে সময়ে ফ্রান্সের বিস্ফোরিত ছাত্র-আন্দোলন শুরু হয়েছিলো, ভিয়েৎনামে আমেরিকার আগ্রাসী যুদ্ধের বিরুদ্ধে। এর সবটা হয়তো ঠিক তা নয়—অন্তত, তৎকালীন ফ্রান্সের ছাত্র-আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী গ্যাব্রিয়েল ও ডানিয়েল কন্-বেন্ডিটের বিবরণ অনুযায়ী।[9] ন্যাঁয়ে (Nantes) বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা, 14 ফেব্রুয়ারী (1968), অধ্যক্ষের অফিসের বাইরে নিজেদের দাবীদাওয়া নিয়ে জমায়েত হলে—অধ্যক্ষ তৎক্ষণাৎ পুলিশকে খবর দেয়, ও দমন-পীড়ন শুরু হয়। ছাত্রদের মধ্যে দমনের বিরুদ্ধে লড়াই থেকেই, সে দিন ছাত্র-বিদ্রোহ সিদ্ধান্ত নিতে থাকে 'মনস্তত্ত্ব'-এর ক্লাশ বয়কট করার। প্রথমের দিকে, ছাত্ররা বিশাল এক আন্দোলনে ফেটে পড়ে 'মনস্তত্ত্ব' বিষয়টার বিরুদ্ধেই। ন্যাঁয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সংগঠন (AGEN-UNEF) সমস্ত ছাত্রদের আন্দোলনের ডাক দেয়,. একটি প্রচারপত্র[10] বিলি করে—এ আন্দোলন বা বিদ্রোহ, পৃথিবীর নানা দেশে নানা মতের ছাত্র-সংগ্রামের পথিকৃৎ কম্পন তুলেছিলো—অবশ্য আমাদের পশ্চিমবঙ্গ বা কলকাতা ছাড়া, যেখানে ছাত্রদের কখনো কোনো বিশেষ পাঠ্য বিষয়কে 'বুর্জোয়া' মনে হয়নি! ফ্রান্সের ছাত্রদের প্রচারপত্রে, 'মনস্তত্ত্ব'-এর ক্লাশকে বয়কট করতে বলা হয়—ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, আকাঙ্খার নির্মলতা, সৃষ্টিশীলতা-ক্রীড়া-কৌতুক-সুখের আনন্দকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য, আধুনিক মনস্তত্ত্বকে সম্পূর্ণ বর্জন করার লক্ষ্যে। এদের মতে, মনস্তত্ত্বের উদ্দেশ্য হলো—একক ব্যক্তির আচরণকে মিথ্যা সামাজিক নিয়ম-শৃঙ্খলার কাছে সুশৃঙ্খলভাবে পদানত করা। এদের মতে—বহু ছাত্র পেশাগত জৌলুসের লোভে, মনস্তত্ত্ব বিষয়টির আসল চরিত্র না জেনেই, তাকে আঁকড়ে ধরে। এ সময়েই বলা হলো—মনস্তত্ত্ব, অপবিজ্ঞানের মোড়কে লুকোনো এক কু-সংস্কারবাদ।

যুব-ছাত্ররা এটুকু বললো, তার সারবত্তা যাই হোক। আমাদের দেশে তখন মনস্তত্ত্বের নামে যা খুশি চলছে। ইতিহাস লিখতে তখন দু'একটা নতুন শব্দ শিখেছি—কিন্তু মন নিয়ে সেই একই তিমিরে।

'মনোরোগী' বা 'মানসিক অসুস্থ' বলা কি অন্যায়?

আগে 'ম্যাড়' শব্দটার মতো 'পাগল' কথাটা খুব চালু ছিলো। আমাদের কবিতায় গানে বার বার আসতো—'খ্যাপা কেন খুঁজিস বিশ্বময়......'। তারপর, মনোচিকিৎসার দোরগোড়ায়, এটাকে একটু ঘষেমেজে 'মনোরোগী' কথাটা চালু হয়ে গেলো—নিশ্চয়ই বিদেশের শব্দ 'মেন্টাল ডিজিজ্', অনুবাদ করে। বেশ, রোগ আর ওষুধের গন্ধ পাওয়া গেলো শব্দটায়। ওষুধ খাচ্ছেন—নিশ্চয়ই 'রোগ হয়েছে'। কিন্তু সত্যিই কি, যে যা খুশি শব্দ চয়ন করতে পারে—মানুষের মনের বিপর্যয়কে তক্‌মা দিতে?

ভারতে মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত আইন, পুরোনো 'ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট,1912', প্রায় 75 বছর চালু ছিলো, ভারতীয় আইন-আদালতের দুনিয়ায়। তখনও ভারতে 'লুনাসি' (যার নিকটতম বাংলা সম্ভবত 'ক্ষিপ্ততা'/'খ্যাপামি') শব্দটি মানসিক বিপর্যয়ের বৈধ রূপ। এই আইনের, 3(5) নম্বর ধারায় সংজ্ঞা আছে—"লুনাটিক' অর্থ হলো ইডিয়ট্ (জড়বুদ্ধি ?) বা অবিন্যস্ত মনের ব্যক্তি'।[11] এ সংজ্ঞাটি এতোই অ-স্বচ্ছ ও জটিল যে, পরবর্তী পৌনে একশত বছর ধরে এর হরেক রকম ব্যাখ্যা আদালতে দেয়া হয়েছে, কখনো কখনো বিপজ্জনকভাবে। যেমন দেখি—লুনাসি (বা ইন্স্যানিটি) শব্দটির সংক্ষেপে সংজ্ঞা হলো—'যুক্তির ত্রুটি', তার আংশিক বা সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি, বা দোদুল্যমানতা।[12] আবার, কেউ হ্যালুসিনেশন্ বা ইল্যুশনে (অলীক কল্পনায়?) ভুগলেও, সে লুনাটিক বা খ্যাপা নয়।[13] সংজ্ঞার যে জটিলতা বা অগভীরতাই থাক না কেন, পৌনে একশত বছর ধরে ভারতীয় আইন কখনো 'মানসিক রোগ' শব্দটি ব্যবহার করেনি—আর করেনি বলেই আইনের ফাঁকে নানা ব্যাখ্যার সুযোগ ছিলো।

তারপর 1987 সালে 'মেন্টাল্ হেল্থ্ অ্যাক্ট্' বা 'মানসিক স্বাস্থ্য আইন' বিধিবদ্ধ হলো—যে আইনের কোত্থাও 'মানসিক রোগ' কথাটি নেই। এই আইনেই ভারতে প্রথম 'হিউম্যান রাইট্স্' বা 'মানবিক অধিকার' শব্দাবলী আইনগতভাবে উচ্চারিত হলো ও স্বীকৃতি পেলো। এই আইনের, 2(1) নম্বর ধারায় সংজ্ঞা আছে—"মানসিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তি' হলো, যে ব্যক্তির, মানসিক প্রতিবন্ধ ছাড়া, কোনো মানসিক বিপর্যয়ের কারণে চিকিৎসার প্রয়োজন আছে।'[14] আর এর মানবিক অধিকারের অধ্যায়ে, 81(1) নম্বর ধারায় আছে—'কোনো মানসিক অসুস্থ ব্যক্তিকে চিকিৎসা করার সময়, কোনো অবমাননা (শারীরিক বা মানসিক) বা নির্মম ব্যবহার

করা যাবে না।'[15] এখানে একটা প্রশ্ন হলো— মনোচিকিৎসাপ্রার্থীকে 'মনোরোগী' বলাটা কি অবমাননা করা, বা বে-আইনী?

মনোচিকিৎসার ইতিহাস ও বিশ্লেষণমূলক লেখায় বিশ্বে সুপরিচিত, চিকিৎসক গ্রেগরি সিল্বুর্গ। সিল্বুর্গের মতে—"মানসিক রোগ' কথাটা ঢিলেঢালাভাবে ব্যবহৃত হয়। শত শত বছর ধরে মানসিক রোগ নিয়ে কাজ করেও, ওষধি-বিজ্ঞান সরল ও সোজা করে বলতে পারলো না, এটা কি বস্তু। অষ্টাদশ শতাব্দীতে শুরু এই 'মানসিক রোগ' কথাটা, ক্রমশই আমরা জেনেছি, মনের কোনো রোগ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিষ।'[16] মনোচিকিৎসা অস্বাভাবিক অবস্থাকে বোঝাবার জন্যে যে সব শব্দাবলী ব্যবহার করে, সেগুলো কোনো রোগকে বোঝায় না। 'মানসিক রোগ' একটা জেনেরিক তক্‌মা মাত্র।[17]

হ্যান্‌স্ ভিগ্যান্ট্ বলেছেন—'আমি ইচ্ছে করেই রোগী বা পেশেন্ট্ শব্দটি ব্যবহার করছি না, শব্দটি মনোচিকিৎসক ও তার মক্কেলের মধ্যে ক্ষমতার অসমতা বাড়ায়। শব্দটি বায়ো-মেডিক্যাল অসুস্থতার ধারণা থেকে উদ্ভূত, যা আমি বিরোধিতা করি।[18]

হিল্ডেগার্ড পেপ্লৌ-এর মতে—'মানসিক অসুস্থতা' শব্দটির পরিবর্তে মানবিক উভয়সংকট বা হিউম্যান্ ডিলেমা কথাটা বোধহয় বেশি উপযুক্ত।[19] নাগরিক অধিকারের, এবং সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেও, এটা দেখা যায়—যারা 'মানসিক অসুস্থদের' নিয়ে বাস করে, তারা আনন্দে সুখে থাকে না। চিকিৎসাপ্রার্থী ও তাদের পরিবার প্রায়ই, 'মানসিক অসুস্থ' কথাটায় লজ্জা বোধ করে।[20] পশ্চিম ইউরোপে, বর্তমান বা প্রাক্তন মনোচিকিৎসাধীনদের, 'মানসিক অসুস্থ' ছাপ দিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভাজনের বিরুদ্ধে, সংগঠিত প্রতিবাদ দেখা যায়।[21]

ওষুধের বাজার, নির্মম বাণিজ্য ও গরীব শিকার

'রোগ' বা 'অসুস্থতা' এলেই 'ওষুধ' আসবে—'ওষুধ' এলেই ওষুধের ব্যবসা থাকবে, টাকার লেনদেন, লাভ-লোকসান থাকবে। বর্তমান নিবন্ধে ব্যবহৃত ক্যাপ্লান-স্যাডকের মনোচিকিৎসার ওষুধের হ্যান্ডবুক (গ্রন্থ.4), ভারতে পুনর্মুদ্রণ করেছে 'সান্ ফার্মাসিউটিক্যাল্‌স্' ওষুধ কোম্পানির পক্ষে বি.আই.পাব্লিকেশন্—বিনা পয়সায় মনোচিকিৎসকদের উপহার দেওয়ার জন্যে। বইটির মলাটের ওপর বিশেষ জ্যাকেটে, রঙিন ফিতে দিয়ে উপহারের প্যাকেটের ডিজাইন। লেখা—'ক্লোফ্রানিল্' প্রস্তুতকারক সান্ কোম্পানির 'শুভেচ্ছা'! এই হলো সমস্ত চিকিৎসার বুনিয়াদ—যার এক নতুন নাম 'ফিজিসিয়ান টেক্নোলজি'!

ভারতে 2001 সালের এপ্রিল মাসে, দেখা যায়—'স্নায়ু-মনোচিকিৎসা' (neuropsychitry) ক্ষেত্রে ওষুধের ব্যবসা হয়েছে 600 কোটি টাকার, যার মধ্যে শতকরা ষাট ভাগ বা 360 কোটি টাকা শুধু 'মনোচিকিৎসা' ক্ষেত্রে ওষুধের ব্যবসা।[22] কতো লক্ষ, বা কতো কোটি ভারতীয় মনোচিকিৎসার ওষুধ খায়?

আফ্রিকার মোজাম্বিক ও জিম্বাবুয়েতে, প্রবঞ্চিত গরীব মানুষের জন্যে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন চিকিৎসক ডেভিড্ স্যান্ডার্স্—গরীব দেশের মানুষের স্বাস্থ্য-বঞ্চনা নিয়ে লিখেছেন এক অমূল্য গ্রন্থ 'দ্য স্ট্রাগল্ ফর্ হেল্‌থ্'(1985)। মনোচিকিৎসার ওষুধের প্রসঙ্গে, স্যান্ডার্স দেখেছেন—1972 সালে, সাধারণ চিকিৎসার শতকরা 17 ভাগ খরচই হয়েছে নানা রকম নিস্তেজক, হিপ্নোটিক, আর অ্যান্টি-ডিপ্রেসান্ট ওষুধে। এ ধরণের ওষুধের প্রেস্ক্রিপ্‌শান্ মেয়েদের ক্ষেত্রে পুরুষের দ্বিগুণ সংখ্যক করা হয়। একটি সমীক্ষায় দেখা যায়—মেয়েদের প্রতি চারজনে একজন নিস্তেজক ওষুধ, সাধারণত ভ্যালিয়াম বা লিব্রিয়াম্ খায়।[23]

একটা গরীব দেশে কি আমরা ওষুধের ব্যবসার মৃগয়াভূমি? তৃতীয় বিশ্বের দেশে ওষুধ ঢোকে, মূল প্রস্তুতকারক আর দেশের মাঝখানের এক বিরাট ব্যবসায়ী চক্রের মারফৎ। তাই, ইউরোপ বা আমেরিকার বাজারে ওষুধের দামের অনেক বেশি পয়সায় আমাদের ওষুধ কিনতে হয়। যেমন, 1975 সালে বৃটেন, ভিটামিন 'সি'-এর জন্যে আমেরিকার কোম্পানিকে দিয়েছে, প্রতি কিলোগ্রামে 2.50 ডলার করে—ভারত সেখানে দিয়েছে 10 ডলার করে। যে টেট্রাসাইক্লিন্ অ্যান্টিবায়োটিক্ ইউরোপে 24 থেকে 30 ডলার—পাকিস্তান, ভারত ও কলোম্বোতে সেটা 100 থেকে 270 ডলার।[24] মনোচিকিৎসার ওষুধের ব্যবসা আরো ভয়ঙ্কর। ওই সাতের দশকের প্রথমের দিকে, কলোম্বিয়াতে—ভ্যালিয়াম্ ও লিব্রিয়াম্ ওষুধ দু'টির দাম, মূল প্রস্তুতকারীদের দামের থেকে, যথাক্রমে শতকরা 6155 ও 6478 ভাগ বেশি ছিলো! অর্থাৎ যথাক্রমে প্রায় 62 ও 65 গুণ বেশি ছিলো! আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই—এই দু'টি ওষুধেই শুধু সারা বিশ্বে ব্যবসায় লাভ হয়েছে 200 কোটি ডলারের বেশি।[25]

কিন্তু এই মনোচিকিৎসার ওষুধ, সমাজের সব আর্থনীতিক শ্রেণী সমানভাবে খায় না। কারণ, মনোচিকিৎসার যাবতীয় তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ভিত্তিই, আর্থনীতিক ও সামাজিক পক্ষপাতিত্বে বা শ্রেণী-বৈষম্যে গড়া। এখানে তার বিশদ আলোচনা করছি না। শুধু উল্লেখ্য যে, 1958 সালের এক গবেষণায় দেখা যায়—মনোচিকিৎসার ক্ষেত্রে বড়োলোকদের মনঃসমীক্ষণ ইত্যাদি করা হয়, আর গরীবদেরকে ওষুধ ইত্যাদি দিয়ে শারীরিকভাবে চিকিৎসা করা হয়। গবেষণায় পরিষ্কারভাবেই দেখা গেছে—মনোচিকিৎসা

পাওয়ার ক্ষেত্রে, আর্থনীতিক মর্যাদা, শিক্ষার সাথে আত্মনির্ভরতা, আত্মনিয়ন্ত্রণের উল্লেখযোগ্য সম্পর্ক রয়েছে।[26] টমাস্ সাজের কথায়—'আমরা ধনী ও প্রভাবশালীদের আত্ম-পরিচালক, দায়িত্বশীল মক্কেল হিসেবে গ্রহণ করি। কিন্তু গরীব আর বৃদ্ধ দেরকে রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী বলে ধরি—ধরে নিই তাদের নিজেদের ভালো বোঝার পক্ষে, তারা অতি অজ্ঞ বা অতি 'মানসিক অসুস্থ'। আমাদের কি এই ধরণের মনোচিকিৎসার আর প্রয়োজন আছে?'[27]

রিক্ত হস্ত, 'অ-শিক্ষিত' গরীব মানুষরা, মানসিক বিপর্যয় নিয়ে এসে দাঁড়ালেই—মনোচিকিৎসা তাদের 'রোগ' ধরতে এগিয়ে আসে, ওষুধ পড়ে—'রোগীর' আত্মীয় বন্ধুরা ধন্য হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে, মনোচিকিৎসা গেড়ে বসে।

মানসিক 'অসুস্থতা' ও 'রোগ' নির্ণয়।

চিকিৎসক থাকে অসুখ-বিসুখ বোঝার জন্যে। মনোচিকিৎসার ক্ষেত্রে তিনি শরীরের অসুখ দেখেন না, মনের অস্বস্তি দেখেন। তাঁর হাতে থাকে, অনেক রকম তক্‌মা—চিকিৎসাপ্রার্থীর গায়ে সেঁটে দিলেই, সে হতভাগ্য 'রোগী'। দারুণ সব ওষুধ, আস্ত মোটা বই লেখা হয় তা নিয়ে। যুক্তি তর্ক নয়—চলতে দিতে হবে। আমাদের সুখ-দুঃখ-ভাবনা-চিন্তা-চারুকলা-সঙ্গীত-সুর-তাল-অধ্যয়ন-ধ্যান-জ্ঞান, সব বিষয়ের ব্যাখ্যা করার একটি বাহিনী থাকবে—তারা 'স্বাভাবিক' 'অস্বাভাবিক' ঠিক করবে। তাঁরা মনোচিকিৎসক।

ম্যাল্কম্ ল্যাডার্ বিশ্ব মনোচিকিৎসক সংস্থার সম্মেলন উপদেষ্টা ও লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোচিকিৎসা-ওষধিতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা দিয়ে, মনোচিকিৎসার সার্বিক বিরোধিতা কখনো করেননি। একেবারে খোলাখুলি তা বলেছেন। কিন্তু দীর্ঘ সমালোচনায় বলেছেন—মানসিক বিপর্যয়ের শ্রেণীবিভাগ এলোমেলো, আর রোগনির্ণয় ও এমন কি উপসর্গ নিয়েও দ্বন্দ্ব আছে। রোগনির্ণয়ে মতের অমিল, আর তার সাথে মনোচিকিৎসার কার্যকারিতার যথেষ্ট প্রমানের অভাব, মনোচিকিৎসাকে চিকিৎসাপ্রার্থীর স্বার্থবিরোধী হওয়ার অভিযোগের বস্তু করে তুলেছে।[28]

চিকিৎসকরা ও পাঠ্যপুস্তকের লেখকরা, রোগনির্ণয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রকাশিত 'রোগের আন্তর্জাতিক শ্রেণীবিভাগ' সংকলনটি ব্যবহার করে থাকেন। এতে, মানসিক বিপর্যয়ের তালিকায় ছিলো—তোৎলামি, অস্ফুট উচ্চারণ (ICD 306.0); ঘুমের মধ্যে হাঁটা (ICD 306.4); অতি-ভোজন (ICD 306.5); উদ্বেগ ও গভীর চিন্তা (ICD 306.9)। মনোচিকিৎসাধীনদের অধিকার বিষয়ক একটি গ্রন্থ, এগুলোকে আমেরিকার এক চিকিৎসকের 1845 সালের অসুস্থতার তালিকার সাথে তুলনা করেছে, যেখানে—অতিরিক্ত পড়াশোনা, সম্পত্তি হারানো, ঠান্ডা জলে যাওয়া, রাজনীতিক উত্তেজনা, ইত্যাদি রোগের দলে পড়ে।[29] টমাস্ সাজের মতে—ব্যবহারিক প্রয়োগ প্রমান করে যে, 'নিউরোসিস্', 'সাইকোসিস্', 'মানসিক অসুস্থতা' ইত্যাদি, মনোচিকিৎসায় রোগনির্ণয়ের সমস্ত শব্দাবলী, প্রধানত, কাউকে বাতিল করার জন্যে মেকী-চিকিৎসাবিজ্ঞানের বাগাড়ম্বরের হাতিয়ার।[30] মার্ক্স্ থেকে পাভ্‌লভ্ পর্যন্ত সবাইয়ের কাছেই, একজন ব্যক্তির অস্তিত্বকে মেনে নেয়া হয়, যদি সে সামাজিকভাবে মানিয়ে নিয়ে থাকে আর কেজো হয়। না হলেই, তার 'চিকিৎসা' হবে 'মানসিক সুস্থ' করার জন্যে—হিউম্যান ইঞ্জিনিয়ারিং বা মানবিক প্রযুক্তির উচ্চকোটি লোকেদের কাছে, তার অভিযোগহীন আত্মসমর্পণের জন্যে।[31] মানসিক অসুস্থতা কথাটার অর্থ পরিষ্কার নয়—অসুস্থ আর তাদের সামাজিক পরিবেশের মধ্যেকার স্বার্থের দ্বন্দ্বকে, যারা ধামাচাপা দেয় বা এড়িয়ে যায়, তারাই বোধ হয় কথাটা ব্যবহার করে।[32] সব রকমের 'যুক্তিবাদী' মনোচিকিৎসার মূল লক্ষ্য ও প্রতিপাদ্যই হলো—একজন, অর্থাৎ চিকিৎসক, তার নিজের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে অপরকে মানসিক অসুস্থ বলে চিহ্নিত করে।[33] মানসিক-বিকারগ্রস্ততার নীতি প্রায় প্রত্যেককে বঞ্চিত করেছে—মনোচিকিৎসার কাছে অনুগ্রহ না নিয়ে, মানুষ হিসেবে তাদের ক্ষয়ে যাওয়া, আর নাগরিক হিসেবে তাদের নির্যাতিত হওয়ার দুঃখকষ্টকে বলার শব্দাবলী ব্যবহার করা থেকে।[34] ভেজাল বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে, আধুনিক মনোচিকিৎসা, মানুষের ব্যক্তিগত দায়িত্বের অস্তিত্ব বা সম্ভাবনা অস্বীকার করে মানুষকে অ-মানবিক বানায়।[35] ক্রমবর্ধমান স্বাধীনতা, স্ব-নির্ভরতা আর দায়িত্বশীলতা মানুষকে মানুষ করে তোলে। ক্রমবর্ধমান দাসত্ব, নির্ভরতা আর দায়িত্বহীনতা, মানুষকে নিছক বস্তু করে তোলে। মানসিক অসুস্থতার ধারণা মানুষকে দাস করে তোলে—একজনের ইচ্ছা আর একজনের ওপর চাপিয়ে দিয়ে। সাজ্ অবশ্যই জানিয়েছেন—মানসিক অসুস্থতার অস্তিত্ব নেই, এ কথার অর্থ নয় যে—এটার সাথে জড়িত সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক ঘটনার অস্তিত্ব নেই।[36]

একজন মানুষের মনে সত্যিই কোনো বিপর্যয় আসতে পারে। সত্যিই সে আগের মতো বা পারিপার্শ্বিকের পছন্দ মতো কাজ বা আচরণ নাও করতে পারে। কিন্তু তাকে সাহায্য করা মানে কি, মনোচিকিৎসা?

জটিল স্নায়ুতন্ত্রে, কোনো রসায়ন 'উত্তেজক' না 'নিস্তেজক', এটা বলা কঠিন। এ প্রসঙ্গে, আইসেনক্ একটি গবেষণার উল্লেখ

করেছেন—'ওষধিতত্ত্ব ও স্নায়ু-শরীরতত্ত্ব থেকে নেয়া 'স্টিম্যুলেশন্', 'ডিপ্রেশন্', 'ইন্হিবিশন্' ইত্যাদি শব্দাবলী, আচরণের খাপ-খাওয়ানোর ব্যাপারে প্রয়োগ করা শুধু অন্যায্য নয়, বাস্তবত বিভ্রান্তিকর।'[37] অ্যাবেল্সন্ বলেছেন—'মানসিক অসুস্থতার ধারণাকে বাতিল করার সঠিক ভিত্তি হলো, মানুষের আচরণ কখনো কার্য-কারণ প্রক্রিয়া দিয়ে নির্দ্ধারিত হয় না।'[38] নার্সিং-বিজ্ঞানের এমেরিটাস শিক্ষক হিল্ডেগার্ড্ পেপ্লৌ লিখছেন—মনোচিকিৎসকদের মধ্যেও 'মানসিক অসুস্থতা' নিয়ে পরস্পর-বিরোধী মতামত আছে। গুরুতর প্রশ্ন হলো—'মানসিক অসুস্থতা'-কে 'রোগ' বলা যাবে কি না। স্বাস্থ্য-পেশাদাররা, 'মানসিক অসুস্থতা' সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করার মানে হলো—প্রত্যেকে তার ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভিন্ন ধরণের চিকিৎসা করে।'[39]

অসহায় মানুষ তার মানসিক বিপর্যয়ে, মনোচিকিৎসকের কাছে শুধু কিছু অন্যায্য, বিভ্রান্তিকর, ভুল, এলোমেলো শব্দের তক্মা আঁটতে যাবে, আর তার সেই নতুন পরিচয়ের ওপর দাঁড়িয়ে, আরো বিপজ্জনক ওষুধ খেতে যাবে?

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া? না, ক্ষতিকারক বা বিষময় প্রতিক্রিয়া?

মনোচিকিৎসক বলে দেন—ওষুধটার 'সাইড্-এফেক্ট' হলো—জিব শুকিয়ে যাওয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য, ঘুম-ঘুম পাওয়া ইত্যাদি। চমৎকার সাবধান বাণী! প্রত্যেকটা ওষুধের আসল চরিত্র থাকে গোপন—মানুষ ঠকে, তাকে ঠকানো হয়। কয়েক মাস পরে, তার শরীরে নানা ব্যাধির হিসেব, আর কারো দায় নয়। চিকিৎসাধীন আত্মহত্যা করলে, মারা গেলে—মানসিক অসুখের দোষ, চিকিৎসা নির্দোষ! এতো বড়ো বিপজ্জনক আর নির্মম প্রতারণা চলছে—মনোচিকিৎসার নামে।

মনোচিকিৎসার আন্তর্জাতিক ওষুধের যাবতীয় তথ্যের বিপুল ভান্ডার ক্যাপ্লান্-স্যাডকের হ্যান্ডবুক (গ্রন্থ ৪)।[40] শুধু মনোচিকিৎসক নয়, হ্যান্ডবুকটি সমস্ত মনোচিকিৎসাপ্রার্থীরই হাতের কাছে থাকা উচিত বলে আমার মনে হয়—যেখানে যাবতীয় ওষুধের সর্ববিধ কার্যাবলী ও ক্ষতিকারক প্রতিক্রিয়া বিশদে লেখা আছে। সস্তায় ভারতীয় সংস্করণ মিলবে। হ্যান্ডবুকটিতে (1993 সালে) আছে—'বেশির ভাগ ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হলো, তাদের প্রাথমিক ওষধি-গতিপ্রকৃতির প্রতিক্রিয়া—বরঞ্চ এগুলোকে ক্ষতিকারক প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখাই বেশি ভালো।'[41] মনোচিকিৎসার একটি সুপরিচিত পাঠ্যপুস্তক (1984 সালের সংস্করণ) অনুযায়ী—সাইড্ এফেক্ট্ বা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ওষুধের মাত্রার ওপর নির্ভরশীল, আর উচ্চমাত্রার ওষুধে যে কারোর ক্ষেত্রেই দেখা দিতে পারে। কিন্তু, বিষময় এবং অতিসংবেদনশীলতার প্রতিক্রিয়া কিছু লোকের মধ্যে দেখা দেয়, আর ওষুধের মাত্রার সাথে তার কোনো ঘনিষ্ঠ যোগ নেই।[42] মনোচিকিৎসার পাঠ্যপুস্তকে, প্রায় সব ওষুধেরই এই টক্সিক্ বা বিষময়, এবং হাইপার্সেন্সিটিভ্ বা অতিসংবেদনশীলতার প্রতিক্রিয়ার দীর্ঘ তালিকা দেখা যায়।

অতি সংক্ষেপে এই বিশাল বিযাক্ত বিপদের আলোচনা করাটা প্রধান জরুরী কাজ।

বিপজ্জনক ওষুধ ও ক্ষতিকারক প্রতিক্রিয়া

মনে হতে পারে—মনোচিকিৎসকরা বিপদ না বুঝে ওষুধ দেন। আসল সত্যটা হলো—সমস্ত প্রবন্ধ ও গ্রন্থতেই, মনোচিকিৎসার ওষুধের বিপদ সম্পর্কে আলোচনা থাকে। এর জন্যে বিশেষ লেখা খুঁজতে হয় না। এমন কি বিপদের গুরুত্বও জোরালোভাবে বলা থাকে। কিন্তু, অসহায় চিকিৎসাপ্রার্থীরা এ কথা জানতে পারে না।

1970 সালের সময়কালে, মনোচিকিৎসার ওষুধের সুদীর্ঘ পর্যালোচনায় দেখা যায়, তার আগের তিন বছরে মনোচিকিৎসার ওষুধের যে অগ্রগতি হয়নি, তাতে চিকিৎসকরা নিশ্বাস ফেলার সময় পেয়েছে, কারণ—যথেষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই ব্যবহার্য ওষুধ আসাতে, তাদের দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ার বিপদ ছিলো। বিশেষ ওষুধের ব্যবহারে, ব্যক্তি-বিশেষের প্রতিক্রিয়া জানার প্রয়োজন ছিলো।[43] এ পর্যালোচনায় দেখা গেছে—ফেনোথাইয়াজিনের আহৃত অন্যান্য ওষুধের মতো, ফ্লুফেনাজিন্ ওষুধটিতে কোনো কোনো সময় বিষন্নতা বা ডিপ্রেশান্ দেখা দেয়—প্রবল ডিপ্রেশান্ ও আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটেছে। এ প্রতিক্রিয়া সুরক্ষিত আবেগের ব্যক্তির ক্ষেত্রে বেশি ঘটে।[44]

মনোচিকিৎসা ও তার ওষুধ, সবটুকুই একটা অজ্ঞানতার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। দীর্ঘ সময় কেটে গেছে, সেই 1970 সালের পর। কিন্তু, এই অন্ধকার বেড়েছে, চিকিৎসাপ্রার্থী বেড়েছে, ওষুধ বেড়েছে—মোটেই কমেনি। মনোচিকিৎসার ওষুধের হ্যান্ডবুকের (1993 সালের) নিরীক্ষায় দেখা যায়—'মস্তিষ্ক ও তার বিপর্যয় সম্পর্কে জ্ঞানের অসম্পূর্ণতার কারণে, মনোচিকিৎসার ওষুধের ব্যবহার অনেকটা নিছক অভিজ্ঞতা-নির্ভর।'[45] বেশির ভাগ মনোচিকিৎসার ওষুধ শুধু একটা মাত্র স্নায়ু-প্রেরককে ক্রিয়া করে না, আর তাদের প্রতিক্রিয়া শুধু মস্তিষ্কেই সীমাবদ্ধ নয়। এই ওষুধের ব্যবহার, স্নায়ু-প্রেরক ব্যবস্থায় ব্যাপক ক্ষতিকারক প্রতিক্রিয়া ঘটিয়ে কাজ করে। আমাদের অনেক জানা ক্ষতিকারক প্রতিক্রিয়ার সাথে যুক্ত স্নায়ু-প্রেরকগুলোকে, এখনোও নির্দিষ্ট করা যায়নি।[46]

আরো নির্দিষ্ট করে দেখি—1990-এর দশকে বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিঙের অন্যতম শিক্ষক ড্যানিয়েল্ শেক্, তাঁর সুপরিচিত গ্রন্থে স্নায়ুতন্ত্রের প্রেরক ব্যবস্থার অধ্যায়ে লিখেছেন—কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে প্রেরক বস্তুর মধ্যে শুধু অ্যাসেটিল্কোলিন নয়, ডোপামিন ইত্যাদি ছাড়াও, এখনও অজানা বস্তুও আছে। শরীরতত্ত্বের ভাষায়, বিভিন্ন সিগ্ন্যাল্ বা সংকেতের পারস্পরিক সম্পর্ক ও কার্যকরী নির্ভরশীলতার বিষয়ে অতি সামান্যই জানা গেছে।[47]

আমরা কারণটা ভালো করে জানলাম না, অথচ—2001 সালের এপ্রিল মাসে, ভারত সরকারের ড্রাগ্স্ টেক্নিক্যাল অ্যাড্ভাইসারি বোর্ডের (Drugs Technical Advisory Board) সুপারিশ অনুযায়ী, স্বাস্থ্য-দপ্তর সরকারীভাবে ডাইফেন্হাইড্রামিন্ হাইড্রোক্লোরাইডের (Diphenhydramine Hydrochloride) সাথে, নির্দিষ্ট যে কোনো মাত্রার 'ডায়াজেপাম' (Diazepam) তৈরি ও বিক্রি নিষিদ্ধ করেছে।[48] নিশ্চয়ই, ভারতের শত শত গ্রাম ও শহরে হাজার হাজার মনোচিকিৎসাপ্রার্থীরা এখনোও এ ওষুধ খাচ্ছে। সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সতর্ক পশ্চিমী সভ্যতা, অনেক দিন ধরে ওষুধের চরিত্র নিয়ে বিব্রত। আমেরিকার নিউ ইয়র্ক রাজ্যে, বেঞ্জোডায়াজেপাইন্ ওষুধ, শিডিউল-2 শ্রেণীভূক্ত, অর্থাৎ ওষুধ কিনতে, মাত্র এক মাসের জন্য গ্রাহ্য, তিন কপি প্রেস্ক্রিপ্শান্ প্রয়োজন।[49]

তিলে তিলে মানুষের মনের সাথে, তাকে এক শারীরিক মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয় মনোচিকিৎসা—সব জেনেই। চিকিৎসাপ্রার্থী ও তার আত্মীয়-বন্ধুরা যার জন্যে আসে, তার উল্টো ফলও হয় কখনো! মনোচিকিৎসার নির্ভেজাল পাঠ্যপুস্তক (1984 সংস্করণ) অনুযায়ী—অ্যাল্কালয়েড় ডেরিভেটিভ্ বা আহৃত ওষুধের মধ্যে প্রধান হলো—রিসার্পিন্, ডেসার্পিডাইন্, রিসিনামিন্, যেগুলো মানুষকে নিস্তেজ করে ও সক্রিয়তা হ্রাস করে। রউওল্ফিয়া অ্যাল্কালয়েড় চিকিৎসায় জটিল বিপদ হলো, ওষুধ প্রয়োগে, আত্মহত্যার প্রবণতার মাত্রায় মারাত্মক ডিপ্রেসিভ্ বা বিষন্ন অবস্থা দেখা দেয়, যার জন্যে ইলেক্ট্রিক্ শক্ দেয়ার দরকার হতে পারে।[50] নিউরোলেপ্টি ক্ ওষুধ ডাইফিনাইল্ পাইপেরিডাইন্-এর বিষময় ও অতিসংবেদনশীলতার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে আছে—ডিস্ক্রাসিয়া বা রক্তে বিষক্রিয়া, বিভিন্ন চর্মরোগ, জন্ডিস, আর মৃগীরোগের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা।[51] নিউরোলেপ্টি ক্ ওষুধ অনেক মাস বা বছর ব্যবহারের পর ডিস্কাইনেসিয়া বা অঙ্গচালনায় বিপর্যয় দেখা দেয়, সাধারণত ওষুধ বন্ধ করলে আরো খারাপ হয়। মহিলা ও বৃদ্ধ দের ক্ষেত্রে এর বিপদ আরো বেশি।[52] পাঠ্যপুস্তকে বলা হয়—ডিপ্রেশানের অনেক ক্ষেত্রে ইপ্রোনিয়াজিড় সাফল্য পেলেও, লিভারে বিষক্রিয়ার মতো এর কিছু ক্ষতিকারক প্রতিক্রিয়া আছে, যেগুলো মারাত্মক হতে পারে।[53] ইপ্রোনিয়াজিডের মতো মনোঅ্যামিন্ অক্সিডেজ্ ইন্হিবিটার্ গোষ্ঠীর ওষুধে, হঠাৎ রক্তচাপবৃদ্ধি র সঙ্কট দেখা দেয়—যখন চিজ্ ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্যের টাইরামিন্কে ভাঙার এন্জাইম্ কাজ করতে পারে না। ফলে রক্তে টাইরামিন্ মিশতে থাকে। হঠাৎ অনেকটা রক্তচাপবৃদ্ধি, দারুণ মাথাধরা দেখা দেয়। কারো কারো এমন কি—সেরেব্রাল্ হিমারেজ্ বা মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়।[54] আর একটি পাঠ্যপুস্তকে (1972 সংস্করণে) দেখি—দীর্ঘদিন নিউরোলেপ্টি ক ওষুধ খাওয়ার পর, ওষুধ ছেড়ে দিলেও, চিকিৎসাধীনদের শতকরা 25 জনের ডিস্কাইনেসিয়া বা অঙ্গসঞ্চালনে বিপর্যয় এবং হাইপার্কাইনেসিয়া বা অতিরিক্ত অঙ্গসঞ্চালনের প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে। পরীক্ষায় অটোপ্সি বা ব্যবচ্ছেদ করে দেখা গেছে—এ ধরণের বিপর্যস্তদের মস্তিষ্কের মধ্যে একটা জৈব পরিবর্তন ঘটেছে।[55]

মনোচিকিৎসার স্বরূপ আরো জানা যায়, কিছু অভিজ্ঞ গবেষক ও চিকিৎসকের পর্যালোচনা পড়ে। আইসেন্ক্, 1961 পর্যন্ত প্রাপ্ত মনোচিকিৎসার ওষুধ সম্বন্ধে অজস্র গবেষণার পর্যালোচনা করে লিখছেন—বিভিন্ন মানসিক বিপর্যয়ে, অ্যাম্ফিটামিন্ প্রয়োগের ফলাফল পরস্পর-বিরোধী। পার্ভিটিন্ ওষুধটির প্রয়োগে দেখা যায়—অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থায় এটি হয় আরাম দেয়, অথবা অধিকতর খারাপ করে। একই মানসিক অসুস্থতা নির্ণয় করার পর দেখা যায়—বিভিন্নজনের ওপর ওষুধের একেবারে পরস্পরের বিপরীত ফল হচ্ছে।[56] ম্যাল্কম্ ল্যাডার (1977 সালে) দেখেছেন—সমস্ত প্রধান নিস্তেজক ওষুধ বা ট্র্যাঙ্কিলাইজার্, স্নায়ুতন্ত্রের পার্কিন্সনিজ্ম্ ও অ্যাকাথিসিয়ার মতো বিপর্যয়ের কারণ হয়। বেশির ভাগ বিপর্যয়, দীর্ঘদিন চিকিৎসায় থাকলে ঘটে—'ডিস্কাইনেসিয়া' এ রকম একটি বিপর্যয়, যা ওষুধ বন্ধ করে দিলেও, সারে না—বরঞ্চ আরো বেড়ে যায়। দীর্ঘদিন ট্র্যাঙ্কিলাইজার্ ব্যবহারকারীদের প্রায় 30 শতাংশ এই বিপর্যয়ের শিকার হয়। আর তাই পুরোনো অসুস্থদের ক্ষেত্রে, এ ধরণের সমস্ত ওষুধের ব্যবহার পুনর্মূল্যায়ণের প্রয়োজন হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে, এই বিপর্যয়ের ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের পক্ষে অনেক মামলা দায়ের করা হয়েছে।[57]

মনোচিকিৎসার ওষুধের হ্যান্ডবুকে (1993 সালে) বলা হয়েছে—মনোচিকিৎসায় নিউরোলেপ্টি ক্ বিপজ্জনক ব্যাধি হলো, জীবন বিপন্নকারী বিপদ—চিকিৎসাকালীন নানা সময়ে এর শুরু। এর উপসর্গগুলো হলো—মাংসপেশী শক্ত হওয়া ও জোর কমা; নিশ্চ লতা; বাক্শক্তিহীনতা; অস্থিরতা; 107° পর্যন্ত জ্বর

ওঠা; ঘামানো: নাড়ী দ্রুত ও রক্তচাপ বৃদ্ধি; রক্তকণিকা (WBC) বৃদ্ধি; প্লাজমায় মাইয়োগ্লোবিন্ থাকার কারণে কিড্নির কাজ বন্ধ হওয়া; ইত্যাদি। প্রায় সময়েই, প্রাথমিক অবস্থায় এই বিপদগুলোকে মানসিক বিপর্যয় বলে ভুল করা হয়। এই প্রতিক্রিয়ায় নারীদের থেকে পুরুষরা বেশি আক্রান্ত হয়—মৃত্যুর হার শতকরা 15 থেকে 25 জন।[58]

মনোচিকিৎসার পুরোনো ওষুধের বদলে, নতুন ওষুধ তৈরীর প্রচেষ্টা চলতে থাকে। এর (1993 সালে) প্রকাশ্য প্রধান কারণ—চালু ওষুধে মারাত্মক বা অবাঞ্ছিত ক্ষতিকারক প্রতিক্রিয়া; অনেক চিকিৎসাধীন মানুষ, চিকিৎসা-রোধী হয়ে যায়; নেতিবাচক উপসর্গের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে ওষুধের অকার্যকরিতা; ইত্যাদি। নতুন অ্যান্টিডিপ্রেসান্ট ওষুধ তৈরীর চেষ্টারও প্রকাশ্য কারণ—বাস্তবে শতকরা 50 থেকে 70 জন বিষন্নতা বা ডিপ্রেশানের অসুস্থদের চিকিৎসায়, চালু ওষুধে কাজ হয় না; ওষুধ ক্রিয়া করতে তিন থেকেছয় সপ্তাহ লাগে; হৃদ্‌পিন্ডের অসুস্থতা ও অন্যান্য ক্ষতিকারক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।[59]

মনোচিকিৎসাপ্রার্থীরা নিজেদের অগোচরে অনেক বড়ো বিপদের মুখে পা বাড়ায়—তাদের মানসিক বিপর্যয় সারাতে! কিন্তু, সমস্ত বিপদ মেনে নিয়ে, সত্যিই কি এ চিকিৎসার দরকার আছে?

মনোচিকিৎসায় 'অসুখ' সারে? 'অসুখ' সারাতে মনোচিকিৎসার কি দরকার আছে?

সত্যিই কি মনোচিকিৎসায় আরোগ্য লাভ হয়? কিসের, কতোখানি আরোগ্য? না কি, অতিরঞ্জন বা অসত্য?

1953 সালে লন্ডনে প্রতিষ্ঠিত 'সামারিটান্' সংগঠন এখন পৃথিবীর নানা দেশে, এ দেশেও, নানা শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত। এদের কাজের পঁচিশ বছর পূর্তিতে, 'আত্মহত্যার উত্তরে' নামে মূল্যবান বিষয়ে এরা বিরাট এক সংকলন প্রকাশ করে। বিশ্বের নানা দেশের চিকিৎসক ও বিজ্ঞজনেরা এ সংকলনে লিখেছে। 'সামারিটান্' মনোচিকিৎসার বা ওষুধ খাওয়ার বিরোধী নয়—কিন্তু, তাদের কাজে সব থেকে গুরুত্ব দেয়া হয় 'বন্ধুত্ব-করা' বা 'বিফ্রেন্ডিং'(befriending)-কে। আত্মহত্যা আটকানোর ক্ষেত্রেও, 'সামারিটান্' সব থেকে গুরুত্ব দিয়েছে, বন্ধুত্ব-করাকে। আর দাবী করা হয়, এর ফলশ্রুতিতে, ইংল্যান্ডে আত্মহত্যার হার কমেছে! কেন 'বন্ধুত্ব'? ওষুধ খেলে হতো না? অনেক মতামতের মধ্যে একটি হলো—ইস্রায়েলের সরকারী চিকিৎসা কেন্দ্রের মনোচিকিৎসার পরিচালক চিকিৎসক জোসেফ হেস-এর। হেস দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন—'যখন দীর্ঘদিনের মানসিক অসুস্থতার প্রশ্ন আসে, সেখানে মোটামুটি তিনভাগের দু'ভাগ ক্ষেত্রে, মনঃসমীক্ষণ বা ওষুধ, অসুস্থকে তার সমাজে পুনর্বাসিত করতে ব্যর্থ হয়।'[60]

চিকিৎসক লার্স্ মর্টেন্সন্ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে জানালেন—সান্ ফ্রান্সিস্কোর 'সোটেরিয়া' আরোগ্যনিকেতনের কর্মীরা কেউই পেশাদার চিকিৎসক নয়। স্কিজোফ্রেনিয়ায় অসুস্থরা এখানে কোনো ওষুধ খায় না, বা সামান্য ওষুধ খায়। দু'বছর বাদে—অন্য চিকিৎসাধীনদের থেকে, মনোচিকিৎসার যে কোনো পরিমাপ অনুযায়ী, সোটেরিয়ার আবাসিকরা সমান বা বেশি ভালো ছিলো।[61] মর্টেন্সন্ আর একটি দৃষ্টান্তে বলেছেন—সুইডেনের স্যেটার্ চিকিৎসালয়ে, 1980 সালে যে 14 জন স্কিজোফ্রেনিয়ায় অসুস্থ, ওখানের সাময়িক কর্মী গৃহবধূ বার্ব্রো সাডিনের অধীনে চিকিৎসায় ছিলো, তারা অন্য মনোচিকিৎসাধীনদের থেকে, মনোচিকিৎসার যে কোনো পরিমাপ অনুযায়ী, বেশি ভালো ছিলো।[62] এখানে মর্টেন্সন্ দেখতে পান—সান্ ফ্রান্সিস্কো ও স্যেটার্ চিকিৎসালয়ের কর্মীরা কোনো মনোচিকিৎসার শিক্ষা ছাড়াই, অসুবিধাজনক পরিবেশে কাজ করেও, মনোচিকিৎসার প্রতিষ্ঠিত ফলাফলকে হারিয়ে দিয়েছে।[63] বিশ্ববিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী আইসেন্‌ক্, অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্বের বিশাল এক কোষগ্রন্থে, 1961 পর্যন্ত প্রাপ্ত অজস্র গবেষণার পর্যালোচনা করে লিখছেন—নিউরোটিক বিপর্যয় নিজেই সীমাবদ্ধ হয়। এ ক্ষেত্রে, মনোসমীক্ষণ অন্য পদ্ধতি থেকে অধিকতর সফল হয় না। সাধারণ জীবনের অভিজ্ঞতা আর অনির্দিষ্ট চিকিৎসার চেয়ে, মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা অধিকতর কোনো আরোগ্য আনতে ব্যর্থ হয়।[64] বহু ক্ষেত্রেই, চিকিৎসকরা ওষুধ সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য হয়েছে। যেমন, ক্লোর্প্রোমাজিন্ ও রিসার্পিন্ উভয়ই অবাঞ্ছিত পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে—উভয়ই পার্কিসন্-মতো অসুস্থতা জন্ম দেয়। আমেরিকায় (1961 সালের সময়ে) এই দুই ওষুধ বহির্বিভাগের রোগীদেরকে দেয়া হতো না। আবার চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রমানিত হয়েছে যে, মেপ্রোবামেট্ ও বেনাক্টাইজিন্ নিস্তেজনার ওষুধ দু'টিও খুব কার্যকরী নয়।[65]

ওষুধে কাজ হয়—এটা সত্যি কি প্রমানিত? আইসেন্‌ক্ ও তাঁর সহযোগী আমাদেরকে একটা সিদ্ধান্তের দিকে টানছেন—1958 সালের গবেষণায় দেখা যায়—মনোচিকিৎসার ক্লিনিকে আবাসিক 142 জনের ওপর ক্লোর্প্রোমাজিন্, বার্বিট্যুরেট্ ও প্ল্যাসেবো বা মেকী-ওষুধের প্রয়োগের ফলাফলকে তুলনা করে দেখা গেলো, এই তিনটি চিকিৎসার মধ্যে কোনো উল্লেখযোগ্য তফাৎ নেই।[66] এঁরা সিদ্ধান্তে আসছেন—একটিমাত্র বিশ্লেষণ ছাড়া, ব্যক্তিত্ব ও

ওষুধের ক্রিয়ার মধ্যে, যৎসামান্যই কার্যকারণ বা সাধারণ সম্বন্ধ দেখা যায়।[67] মনোচিকিৎসার আমেরিকান হ্যান্ডবুকে (1975 সালে) দেখা যায়—স্কিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্তদের ওষুধ বন্ধ করার পর, প্রায় 6 মাসের মধ্যে শতকরা 50 জনের আবার অসুস্থতা দেখা দেয়—বাকি শতকরা 50 জন ভালো থাকে। গুরুত্ব-সহকারে এখানে সিদ্ধান্ত করা হচ্ছে—অর্থাৎ, চিকিৎসাধীনদের শতকরা 50 জনই বিনা প্রয়োজনে ওষুধ খেয়েছে।[68]

শরীর নিজে কি সেরে উঠতে পারে? যদি পারে, তবে ওষুধ খাবো কেন? এ প্রশ্ন আরো প্রাসঙ্গিক, মনোচিকিৎসার ওষুধের ক্ষেত্রে। এটা বেশ লক্ষণীয় যে, স্নায়ুতন্ত্রে সংকেত প্রেরণের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে, ড্যানিয়েল্ শ্নেক্ বলছেন—চিকিৎসকদের সৌভাগ্যবশত, শতকরা 70 থেকে 80 ভাগ ক্ষেত্রেই, চিকিৎসকদের 'শিক্ষিত আন্দাজে' কাজ হয়ে যায়। এর প্রাথমিক কারণ হলো—বেশির ভাগ অসুস্থতাই, চিকিৎসা ছাড়াই, নিজে থেকে সেরে যায়। মানুষের দেহ নিজে নিজে সেরে ওঠার জন্যে রীতিমতো তৈরী, আর চিকিৎসকরা প্রথমত 'সময় কেনে', যাতে শরীর নিজে নিজে সেরে উঠতে পারে। সব সময়ই, এ ওষুধ সে ওষুধে কাজ হচ্ছে কি না পরীক্ষা করা, আর সামান্য ভাগ্য, এর সাথে জড়িত! বাস্তবত, চিকিৎসাবিদ্যা এখনও একটা শিল্পকলা, এটা বিজ্ঞান নয়।[69]

ভারতে কেন এমনভাবে ভাবনা-চিন্তা করা হচ্ছে না—অনেকেই নিশ্চয়ই সততার সাথে, মানুষের মানসিক বিপর্যয়ে উপকার করতে আগ্রহী। এ প্রসঙ্গে কবে আমরা আরো গভীরে ভাববো?

মনোচিকিৎসার ভারতীয় গবেষক শুভ কুমার ও তারা শ্রীনিবাসন, ভারতের স্কিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্তদের চিকিৎসা সম্বন্ধে (1992 সালে) মন্তব্য করছেন—ইতিবাচক উপসর্গ নিয়ন্ত্রণে ওষুধ কাজ করলেও, সেটা অসুস্থতাকে আর তার সামাজিক প্রতিক্রিয়াকে মোকাবিলা করতে বাস্তবত কোনো সাহায্য নাও করতে পারে। নিজের আরোগ্য প্রক্রিয়ায় চিকিৎসাধীনকে জড়ানো তাই, আরোগ্য প্রক্রিয়ায় প্রধান অগ্রগতি।[70] পশ্চিমের দুনিয়ায়, এই নিজে মোকাবিলার বিষয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে—ভারতে এ বিষয়ে যৎসামান্য কাজ হয়েছে।[71] 50 জন ভারতীয় চিকিৎসাধীন স্কিজোফ্রেনিকদের মধ্যে দেখা গেছে—তারা নিজেরা নিজেদের অসুস্থতার মোকাবিলার অনেক উপায় ব্যবহার করে—অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, তারা তাদের ভেতরের পরিবর্তন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনুভূতিহীন ও অন্তর্দৃষ্টিহীন নয়।[72] এ তো অবাস্তব কথা নয়। আরো আরো অনেক করার আছে, জানার আছে।

কোথায় দাঁড়িয়ে..........মানসিক 'সুস্থতা'

এরিক ফ্রোম্ একটি 'সুস্থ-মনের সমাজ' সম্পর্কে তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থে আলোচনা করতে বসে, শুরুতেই দেখেছেন—আত্মহত্যার কারণ জটিল। তবুও এরিক্ ফ্রোম্ ধরে নিচ্ছেন—জনসাধারণের মধ্যে আত্মহত্যার হার, তাদের মানসিক স্থিরতা ও মানসিক সুস্থতার অভাবের প্রকাশ।[73] বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (1951, 1952) প্রকাশনায় দেখা যায়—বিশ্বের মধ্যে আত্মহত্যার সর্বোচ্য হার হলো, ডেনমার্ক, সুজারল্যান্ড, ফিন্ল্যান্ড, সুইডেন, আমেরিকা, ফ্রান্সে।[74] পশ্চিমের দুনিয়ার সামাজিক-আর্থনীতিক বিকাশের লক্ষ্য হলো বস্তুগত আরামের জীবন, সম্পদের আপেক্ষিক সম-বন্টন, স্থির গণতন্ত্র ও শান্তি—যে সব দেশ এই লক্ষ্যের সব থেকে কাছে, তাদের মধ্যে সব থেকে মারাত্মক মানসিক ভারসাম্যহীনতা দেখা যায়।[75]

আমাদের দেশে, মনোচিকিৎসার ধ্যান-ধারণা এসেছে যে সব দেশ থেকে—তারা নিজেরাই মানসিক স্থিতাবস্থা অর্জন করতে পারেনি। যুদ্ধ-বিগ্রহ, হিংস্রতার সাথে, আত্মহত্যা তাদের মনস্কতা। আমরা তাদের এক মানসিক-উপনিবেশ হয়ে আছি। ভুলে গেছি, অত্যধিক মনোচিকিৎসা-কবলিত সমাজের বাস্তব বিপদের কথা। কখনো মতাদর্শের, কখনো ওষুধের বিপদ। সমাধান কেউ এক কথায় বলতে পারে না। তবু অনেকে টুকরো টুকরো পর্যবেক্ষণে, বাঁচাতে চাইছে আমাদেরকে, মানুষ হিসেবে।

লার্স মর্টেন্সন্ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন—নিউরোলেপ্টিক ওষুধ নিষিদ্ধ করা হলো, সব থেকে সরাসরি ও স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত। মনোচিকিৎসার ইতিহাস ভয়াবহ। নিউরোলেপ্টিক ওষুধে বিপর্যয়, মনোচিকিৎসার ইতিহাসে নজিরবিহীন।[76] হয়তো, কোনো দিনই রাষ্ট্র ও ক্ষমতাশালীরা এ কথা মানতে চাইবে না। আবার আইনজ্ঞ জুনে রেস্নিক্ জার্মান্ বলেন—যে কোনো মনোচিকিৎসাধীন মানুষ, মানবিক মর্যাদার সাথে চিকিৎসা প্রত্যাশা করে। চিকিৎসাধীনকে, মনোচিকিৎসার উপকারী ও ক্ষতিকারক প্রতিক্রিয়ার কথা ব্যাখ্যা করে জানানো উচিত।[77] এটুকুও কি আমরা করতে পারি না? দেখছি তো, মনস্তত্ত্ব ও দর্শনের গবেষকদের (1977 সালের) মতে—মানসিক বিপর্যয়ের উপসর্গগুলো অপ্রতুলতার প্রমান নয়, সেগুলো বাইরের পীড়নের যথাযথ সাড়া হতে পারে।[78] আমরা যাকে মানসিক অসুস্থতা বলি, সেটাকে পীড়নের সাড়া হিসেবে নতুন করে বুঝতে হবে—যে পীড়ন সামাজিক পরিবেশের কোনো না কোনো কারণে ঘটে।[79] এভাবে ভাবতেও তো পারি আমরা? বিশ্বে আমরা মোটেই একা নয়।

1971 সালে মনোচিকিৎসার মর্যাদা বাঁচাতে, ব্রিটেনের রয়াল

কলেজ অফ্ সাইকিয়াট্রিস্টের উদ্যোগে দেখা দিলো, রয়াল মেডিকো-সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন। কিন্তু, মনোচিকিৎসার বিরুদ্ধে জনমত রয়ে গেলো, নানা অপকর্মের অভিজ্ঞতার জন্যে। ন্যাশনাল সোসাইটি ফর ল্যুনাসি রিফর্মের মতো আগেকার মঞ্চগুলোকে ছাপিয়ে, এখন প্রতিবাদ ধ্বনিত হলো—মনোচিকিৎসা ভীষণভাবে তাত্ত্বিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হলো।[80] ব্রিটেনে মনোচিকিৎসা-বিরোধিতার প্রধান প্রবক্তা আর.ডি.ল্যেং এবং ডেভিড কুপার, উভয়েই মনোচিকিৎসার প্রাতিষ্ঠানিক যোগ্যতাসম্পন্ন। চিকিৎসাধীনদের রাজনীতিক সংগঠন খোলাখুলিভাবে মনোচিকিৎসার বিরোধী-বিশ্লেষণে নামলো। ব্রিটেনে মেন্টাল্ পেশেন্ট্স্ ইউনিয়ন্ 'অত্যাচারী মনোচিকিৎসা আর তার 'মানসিক অসুস্থতা'-র অপ-সংজ্ঞাকে' চ্যালেঞ্জ জানালো। তারা বললো—'অত্যাচারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ক্রোধ ও হতাশাকে অন্তরস্থিত করার জন্যে, পুঁজিবাদের হাতিয়ারগুলোর একটি হলো মনোচিকিৎসা।' এদের মতোই—আমেরিকায় মেন্টাল পেশেন্ট্স্ লিবারেশন্ ফ্রন্ট্; জার্মানীতে 1972 সালে, হাইডেল্বার্গ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের নৈরাজ্যবাদীদের প্রতিষ্ঠিত, সোসালিস্ট্ পেশেন্ট্স্ কালেক্টিভ্।[81] নেদারল্যান্ডে হাসপাতালের পরিচালন ব্যবস্থায়, চিকিৎসাধীনদের রাখার চেষ্টা হলো। ডেনমার্কে গড়ে উঠলো ম্যাড্ পিপল্স্ মুভ্মেন্ট্স্, আর অ্যামেলির আড্ডা। এই ধারা বয়ে চললো দশকেরপর দশক—ইন্টার্নেটে দেখা গেলো 'অ্যান্টি-সাইকিয়াট্রি কোয়ালিশন্' (antipsychiatry.com) আর 'ম্যাড্নেশন্' (madnation.org)। খবর অনেক, মনোচিকিৎসার বিরুদ্ধে জনকণ্ঠ। আমাদের আরো একবার ভাবতে হবে—আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে!

নির্দেশিকা

1. 'It is interesting that Jasper (1948), perhaps the most sophisticated and knowledgeable of modern psychiatrists, has no doubt in his own mind that, as far as therapeutic success is concerned, psychiatrists and psychoanalysts are decidedly inferior to all sorts of quacks and "headshrinkers".' গ্রন্থ.7, পৃষ্ঠা.721পাদটীকা.

2. 'Rulers have always conspired against their subjects and sought to keep them in bondage; and, to achieve their aims, they have always relied on force and fraud. Indeed, when the justificatory rhetoric with which the oppressor conceals and misrepresents his true aims and methods is most effective—as had been the case formerly with tyranny justified by theology, and is the case now with tyranny justified by therapy—the oppressor succeeds not only in subduing his victim but also in robbing him of a vocabulary for articulating his victimization, thus making him a captive deprived of all means of escape. The ideology of insanity has achieved precisely this result in our day.' গ্রন্থ.3, পৃষ্ঠা.5.

3. 'How could the amateurs beat the professionals right away? There are two obvious reasons: the amateurs had more love. The professionals care with a poisoned team.' গ্রন্থ.5, পৃষ্ঠা.122.

4. 'Psychiatry is a practical art at best, involving experience, training, insight, but it is not a science applying causal theories and laws. The myth we need to free ourselves from is not that of mental illness, but that of causal determinism, the myth of an emperor whose transparent gown is woven of nonexistent laws of human behavior.' গ্রন্থ.2, পৃষ্ঠা.236.

5. 'Instead of changing the commas in the special law for mentally ill persons, it might be an idea to start making special laws for generals, politicians and in some cases psychiatrists, making it possible to lock them up if they are estimated as being dangerous for their surroundings.' গ্রন্থ.22, পৃষ্ঠা.21.

6. 'In my opinion, the best overall solution would be to ban psychiatric institutions in the Netherland, in Europe and in the world.' গ্রন্থ.23, পৃষ্ঠা.283.

7. গ্রন্থ.12.

8. '........by forcing psychiatry to acknowledge the moral dilemmas and social relations involved in its activities with "patients". Szasz has performed an important sevice. Quite probably he has done more than any other man to alert the American public to the potential dangers of an excessively psychiatrized society." গ্রন্থ.12, পৃষ্ঠা.76.

9. গ্রন্থ.25, পৃষ্ঠা.30-2.

10. 'NOTICE CONSIDERING that psychology as such aims at the systematic subordination of individual behaviour to false social norms; CONSIDERING that psychology is increasingly being forced into the mould of American psycho-sociology, aimed at perfecting the system by conditioning the workers to consume more and more rubbish while acquiescing in economic exploitation; CONSIDERING that psycho-sociology is nothing but the justifcation of 'ideal' norms and a means of concealing the monstrous discrepancy between the ideal and the real; CONSIDERING that this type of psychology is being used on the one hand to subvert the workers' struggle and on the other hand is being disseminated by means of the universities, the professional classes, and the advertising media; CONSIDERING that many students have embraced psychology in ignorance of its true nature, and because they are seduced by its professional glamour; CONSIDERING that they have been deceived by a form of obscurantism hiding under a ridiculous pseudo-scientific cloak, and representing a vicious assault upon liberty; CONSIDERING that the total rejection of modern psychology is a reaffirmation of PERSONAL LIBERTY, of the INNOCENCE OF DESIRE, of the forgotten JOYS OF CREATIVITY, PLAY, IRONY, and HAPPINESS ..... THE AGEN-UNEF THEREFORE CALLS ON ALL STUDENTS OF PSYCHOLOGY TO ABANDON THEIR STUDIES.' গ্রন্থ.25, পৃষ্ঠা.30-1.

11. Sec.3(5): '"Lunatic" means an idiot or person of unsound mind.' গ্রন্থ.14, পৃষ্ঠা.974.

12. 'Lunacy or insanity may be shortly defined as a defect of reason, consisting either in its total or partial absence or in its perturbance.' গ্রন্থ.14, পৃষ্ঠা.975.

13. 'A man who suffers from hallucinations and illusion is not necessarily insane.' গ্রন্থ.14. পৃষ্ঠা.975.

14. Sec.2(l): '"mentally ill person" means a person who is in need of treatment by reason of any mental disorder other than mental retardation.' গ্রন্থ.15, পৃষ্ঠা.2.

15. Sec.81(1): 'No mentally ill person shall be subjected during treatment to any indignity (whether physical or mental) or cruelty.' গ্রন্থ.15, পৃষ্ঠা.30.

16. 'It must be borne in mind that the term "mental disease" is used rather loosely. After centuries of dealing with mental disease, medicine is still unable to give a simple and straight statement of

what it is. The reasons for this inability are many and complex..... But the term "mental disease", introduced by Linné and Macbride in the eighteenth century, still carried the suggestion that it was a disease of the mind, of reason, though we have gradually learned that this is not entirely the case.' গ্রন্থ.11, পৃষ্ঠা.51.

17. 'The various appellations which are used in psychiatry to denote various abnormal conditions do not denote diseases in the strict sense of the word. The term "mental disease" is only a generic designation.' গ্রন্থ.11, পৃষ্ঠা.140.

18. 'In my argument, I deliberately left out the word patient because I think that this word accentuates the inequality in power between the client and the psychiatrist, and that this word proceeds from bio-medical illness concept, a concept I am opposed to.' গ্রন্থ.23, পৃষ্ঠা.283.

19. 'Clearly a rubric more distinctive of the phenomena in question ought to be substituted for the phrase "mental illness." Perhaps human dilemmas would be a more apt term.' গ্রন্থ.16, পৃষ্ঠা.208.

20. 'Those who live with the mad are introduced to a dimension of social relationships which is rarely pleasant and rarely without acrimony or recriminations. Attempts to see 'mental illness as like any other illness' can, for many patients and families, become at worst dishonest and at best a charade..... Treatment in mental hospitals still contains moral exhortations, and patients and their families often feel shame at being called 'mentally ill'.' গ্রন্থ.21, পৃষ্ঠা.5.

21. 'The growing concern for use of compulsion in the treatment of the mentally ill may be seen as a facet of public reaction generally to discrimination of minority groups, but it is in fact principally the product of the loud protests of those in our society diagnosed as "mentally ill". Western Europe has witnessed the organized protest of groups of patients or ex-patients from psychiatric hospitals and departments against discrimination of them on many fronts, protests which are often strongly seconded by relatives and progressive therapists.' গ্রন্থ.29, পৃষ্ঠা.10.

22. 'The neuropsychiatry segment in India is valued at Rs.600 crores .... of that 40 per cent are related to neurology and the remaining to psychiatry.' *The Asian Age*, 24 April 2001.

23. 'In 1972, tranqillizers, hypnotics and anti-depressants accounted for about 17 per cent of GPs' [general practitioners'] pharmaceutical expenditure and twice as many women as men are receiving prescriptions of this kind. A more recent survey by *Woman's Own* also found that one in four women were taking tranquilllizers or sedatives, usually Valium (diazepam) or Librium (chlordiazepoxide).' গ্রন্থ.24, পৃষ্ঠা.126-8.

24. 'Whereas Britain in 1975 paid American firms $2.50 per kilogram for vitamin C, India paid nearly $10 per kilo..... Similarly the tetracycline antibiotics, costing at that time $24-30 in Europe, were being sold to Pakistan, India and Colombia for between $100 and $270.' গ্রন্থ.24, পৃষ্ঠা.136.

25. 'For Valium (diazepam) and Librium (chlordiazepoxide), the two worst cases, overpricing [in the early 1970s, in Colombia] was 6155 per cent and 6478 per cent respectively! It is hardly surprising that the world-wide profit on these two drugs alone was over $2000 million.' গ্রন্থ.24, পৃষ্ঠা.136.

26. '[Hollingshead and Redlich (1958)] found, for example, that affluent psychiatric patients tend to receive psychotherapy, while poor patients are treated with physical interventions......Hollingshead and Redlich's findings clearly demonstrate, however, that there are significant connections between economic status, education, and a self-responsible, self-determinate mode of orienting one's self to a help-seeking situation.' গ্রন্থ.1, পৃষ্ঠা.61.

27. 'We regard the rich and influential psychiatric patient as a self-governing, responsible client—free to decide whether or not to be a patient. But we look upon the poor and the aged patient as ward of the state—too ignorant or too 'mentally sick' to know what is best for him..... Do we really need more of this kind of psychiatry?' গ্রন্থ.3, পৃষ্ঠা.85.

28. 'The classification of psychiatric disorders remains chaotic, and there is contention about diagnosis and even symptoms...... The lack of agreement on diagnosis, together with the paucity of convincing proof of the effectiveness of psychiatric treatment, leaves psychiatrists vulnerable to the charge of acting against the best interests of their patients.' গ্রন্থ.4, পৃষ্ঠা.9.

29. 'The International Classification of Diseases [WHO,1974 and *Glossary,1974*] still list the following conditions in their classification of mental disorders : stammering, stuttering, and lisping (ICD 306.0), sleep-walking (ICD 306.4), over-eating (ICD 306.5) and agitation and rumination (ICD 306.9). Compare this with a New York physician's categorizationn in 1845 which in retrospect may not seem so naive and foolish after all. He listed forty-three causes for the disease among 551 patients. They ranged from ill-health (104), religious anxiety (77), loss of property (28), excessive study (25), blows on the head (8), political excitement (5), disappointed ambition (41), and going into cold water (1). This physician's classification is aetiological rather than nosological, and cannot be strictly compared, but it is no less crude than some of the categories listed in the ICD.' গ্রন্থ.21, পৃষ্ঠা.5.

30. 'My thesis that terms like 'neurosis', 'psychosis', 'mental illness'—indeed, the whole gamut of psychiatric diagnostic labels—function mainly as counters in a pseudomedical rhetoric of rejection may be readily documented by examining their actual usage.' গ্রন্থ.3, পৃষ্ঠা.60.

31. 'As with the early Saint-Simonians and their later disciples, from Comte through Marx to Pavlov and Skinner, the individual should be allowed to exist only if he is socially well adapted and useful. If he is not, he should be 'therapized' until he is 'mentally healthy'—that is, uncomplainingly submissive to the will of the élites in charge of Human Engineering.' গ্রন্থ.3, পৃষ্ঠা.219.

32. 'Mental illness' is an ambiguous label. Those who use it seem to wish to straddle and evade the conflict of interests between the patient and his social environment (relatives, society, etc.).' গ্রন্থ.1, পৃষ্ঠা.71.

33. 'The premise that the behavior of persons said to be mentally ill is meaningful and goal-directed—provided one is able to understand the patient's behavior from *his* particular point of view—underlies all "rational" psychotherapies.' গ্রন্থ.1, পৃষ্ঠা.59.

34. '....[The ideology of insanity] has succeded in depriving vast numbers of people—sometimes it seems very nearly everyone—of a vocabulary of their own in which to frame their predicament without paying homage to a psychiatric perspective that diminishes man as a person and oppresses him as a citizen.' গ্রন্থ.3, পৃষ্ঠা.5-6.

35. '...... [The] claims and practices of modern psychiatry dehumanize man by denying—on the basis of spurious scientific reasoning—the existence, or even the possibility, of personal responsibility. But the concept of personal responsibility is central to the concept of man as moral agent.' গ্রন্থ.3, পৃষ্ঠা.11.

36. 'While I maintain that mental illnesses do not exist, I obviously do not imply or mean that the social and psychological occurences to which this label is attached also do not exist............Progressive freedom, independence, and responsibility lead to being a man; progressive enslavement, dependence, and irresponsibility, to being a thing. Today it is inescapably clear that,

regardless of its origins and aims, the concept of mental illness serves to enslave man. It does so by permitting—indeed commanding—one man to impose his will on another.' গ্রন্থ.3,পৃষ্ঠা.21 এবং 47.

37. 'In the complex organization of the central nervous system it is difficult to determine whether a compound is true 'stimulant' or 'depressant' on the basis of gross observations in the intact animal....... Wikler (1950) points out : "The use of terminology borrowed from pharmacology or neurophysiology such as 'stimulation', 'depression', 'facilitation' and 'inhibition' to describe phenomena concerned with total adaptive behviour is not only unjustified, but actually misleading."' গ্রন্থ.6,পৃষ্ঠা.642.

38. 'In my opinion, the correct ground for rejecting the concept of mental illness is..... in the fact that human conduct is not completely determined by causal processes.' গ্রন্থ.2, পৃষ্ঠা.234.

39. 'Within the intellectual community—among the psychiatric professionals—there are fresh discussions and contradictory views on the nature of "mental illness." So-called mental illness is of a very different views from organic or physical diseases. There is a serious question if "mental illness" ought to be called a "disease." Once there was an advantage to such a designation, when the causes were thought to "devils" and "treatment" was incarceration in dungeons or jails among other cruel forms of care. Now with contemporary understandings, there is the question of whether human perplexity is a sickness. The difficulties of the "mentally ill" are conceptualized in differen ways by health professionals, and each viewpoint gives rise to a different form of treatment." গ্রন্থ.16, পৃষ্ঠা.208.

40. গ্রন্থ.8.

41. 'The side effects of most drugs are often a direct result of their primary pharmacodynamic effects and are better conceptualized as adverse effects.' গ্রন্থ.8, পৃষ্ঠা.9.

42. 'Side effects depend entirely on dosage and may occur in any patient if the dose is high enough. Toxic and hypersensitivity reactions occur only in some patients and are not closely correlated with dosage.' গ্রন্থ.9, পৃষ্ঠা.331.

43. 'There have been no major advances with psychotropic drugs since the last review appeard three years ago (*The Practitioner*, October 1967,**199**,553).The breathing space obtained is in a sense welcome , since practitioners were in danger of becoming confused by the influx of potent but often inadequately tested drugs. The great need is for better means of predicting how individual patients will respond to particular drugs.' গ্রন্থ.26, পৃষ্ঠা.307.

44. 'Depression sometimes develops during treatment with fluphenazine, as it may with any of the phenothiazines. Severe depression, and suicide, have been reported. Such reactions are more likely to occur in patients with well-preserved emotional reactions, in schizo-affective rather than classical schizophrenic states.'গ্রন্থ.26, পৃষ্ঠা.312.

45. 'Because of incomplete knowledge regarding the brain and the disorders that affect it, the drug treatment of psychiatric disorders is somewhat empirical.' গ্রন্থ.8, পৃষ্ঠা.1.

46. 'Most psychotherapeutic drugs do not affect a single neurotransmitter system, nor are their effects localized to the brain. The effect of psychotherapeutic drugs on neurotransmitter systems result in the wide range of adverse effects associated with their use......There are also several commonly observed adverse effects for which the neurotransmitters involved have not been specifically identified.' গ্রন্থ.8, পৃষ্ঠা.18.

47. '...[In] the central nervous system, the transmitter substance may include not only acetylcholine, but norepinephrine, dopamine, and others, as well, some of which have not even been identified as yet..... In physiologic terms, very little is known about the inter-relationships and functional dependencies that exist between the disturbing signals, u , the control signals, u , and the feedback signals, u , that constitute the input/output characteristics of the controlled elements in physiologic systems.' গ্রন্থ.13, পৃষ্ঠা.485-88.

48. 'Taking into account the harmful effects of the fixed dose combination of Diazepam with Diphenhydramine Hydrochloride, the government on Tuesday banned its manufacture and sale.' *The Asian Age*, 18 April 2001.

49. 'In New York State benzodiazepines are treated as schedule II substances, which require a triplicate prescription for a maximum of one month's supply.' গ্রন্থ.8, পৃষ্ঠা.13.

50. 'The main alkaloid derivatives are reserpine, deserpedine and resinamine, all of which produce tranquillisation and reduction of activity..... A serious complication of *Rauwolfia* alkaloid therapy is the occurence of severe depressive state, which may of suicidal intensity and may need electroconvulsive therapy.' গ্রন্থ.9, পৃষ্ঠা.329.

51. '*Toxic and hypersensitivity reactions* [of the neuroleptic Diphenylbutyl Piperidines] include blood dyscrasias, dermatitis, which is usually light-sensitive and appearing on the exposed areas, jaundice and increased tendency of epilepsy.' গ্রন্থ.9, পৃষ্ঠা.332.

52. 'Dyskinesias appear after many months or years of treatment with neuroleptic drugs and usually worsen during withdrawal of the drug..... Older people and women appear to more at risk.' গ্রন্থ.9, পৃষ্ঠা.332.

53. 'Although iproniazid [Monoamine Oxidase Inhibitor] is undoubtedly efficacious in the treatment of many cases of depression, some of its adverse reactions were found to be serious, particularly its hepatotoxicity which sometimes proved fatal..... Attempts were therefore made to discover new drugs with comparable or greater efficacy, and it was hoped, with greater safety....... The most potent drugs in this class are iproniazid and tranylcypromine, but these also tend to have a rather high incidence of side effects.' গ্রন্থ.9, পৃষ্ঠা.333.

54. '.....[These cheese, marmite, bovril etc.] foodstuffs which contain tyramine can induce one of the most dramatic adverse reactions—the hypertensive crisis..... in patients on monoamine oxidase inhibiting drugs, the enzymes responsible for breaking down tyramine are inhibited, and the latter is therefore absorbed into the blood stream causing a massive release of noradrenalin. This cause sudden marked rise of in blood pressure which is fluctuating and causes an intense headache and in some people may even cause a cerebral haemorrhage.' গ্রন্থ.9, পৃষ্ঠা.334.

55. '[Freedman, A.M., et al. *Modern Synopsis of Comprehensive Textbook of Psychiatry*, 1972] concludes with a sobering statement : About 25 percent of patients treated with long term neuroleptic drug therapy develop extrapyramidal dyskinesias and hyperkinesia that persist after the drugs are discontinued. A recent comparative study of autopsy material demonstrated anatomical brain changes in patients displaying such a syndrome.' গ্রন্থ.19, পৃষ্ঠা.227.

56. 'The reports of the effects of the amphetamines in different psychiatric disorders are somewhat conflicting. "The literature on Pervitin has consistently revealed that this drug may either relieve or exacerbate the same abnormal mental state." Normal subjects are said to be more affected by these drugs than are psychotics (Davidoff, 1936; Davidoff and Reifenstein, 1937), but even psychotics with the same diagnosis may be affected in diametrically opposite ways.' গ্রন্থ.6, পৃষ্ঠা.644.

57. 'All major tranquillizers can induce neurological complications such as parkinsonism (stiffness and trembling) and akathisia,

in which the patient cannot keep still. The most worrying side-effects of the major tranquillizers are disabilities which only come on after several years' treatment. The best-documented is 'dyskinesia', which comprises repetitive tic-like movements of the mouth and tongue. Unlike most other side-effects, dyskinesia does not usually disappear when the drugs are discontinued; it may even get worse. Estimates of the incidence of this condition in patients taking long-term tranquillizers range up to thirty per cent and have led to a reappraisal of the whole value of these drugs in chronically ill patients. In the United States suits for damages have been filed on behalf of patients so disabled.' গ্রন্থ.4, পৃষ্ঠা.63-4.

58. 'Neuroleptic malignant syndrome is life-threatening complication of antipsychotic treatment,with a variable time of onset during treatment. Symptoms include muscular rigidity and dystonia, akinesia, mutism, obtundation, and agitation. Autonomic symptoms include hyperpyrexia (up to 107°F), sweating, and increased pulse and blood pressure. Laboratory findings include increased white blood cell count (WBC), blood creatinine phosphokinase, liver enzymes, and myoglobin in plasma resulting in renal shutdown..... The diagnosis is often missed in the early stages, and the withdrawal or agitation may be mistakenly considered increased psychosis. Men are affected more frequently than woman, and the mortality rate is between 15 and 25 percent.' গ্রন্থ.8, পৃষ্ঠা.125.

59. 'The major reasons to develop new antipsychotic compounds are (1) the association of current compounds with serious or undesirable adverse effects (for example, extrapyramidal symptoms,tardive dyskinesia, anticholinergic activity, and adverse cardiovascular effects); (2) the existence of many treatment-resistant patients; and (3) the general lack of efficacy of the standard antipsychotics for the treatment of negative symptoms..... The major reasons to develop new antidepressant compound are (1) the fact that 50 to 70 percent of the depressed patients do not respond to currently available antidepressant, (2) the three- to six-week delay in the therapeutic effects, and (3) the presence of many cardiovascular and other adverse effects.' গ্রন্থ.8, পৃষ্ঠা.238-9.

60. 'The new drugs against psychosis and depression which appeared in the 'fifties and 'sixties of this [20th] century likewise gave rise to exaggerated expectations. The fact is that, when it is a question of prolonged mental illness, in roughly two-thirds of the cases neither psychoanalysis nor drug therapy succeed in rehabilitating the patient into the community.' গ্রন্থ.27, পৃষ্ঠা.60.

61. 'Soteria house was a home-like residence in the San Francisco area. The staff consisted of non-professional therapist...... Afterwards the Soteria patients were compared with similar patients admitted to a regular psychiatric clinic. The latter received neuroleptic drugs as usual. The Soteria patients received no or little drugs. After two years in Soteria, [schizophernic] patients were equal or superior to the control patients by all psychiatric measures.' গ্রন্থ.5, পৃষ্ঠা.118.

62. 'In 1980 fourteen schizophrenic patients, who started psychotherapy with [Barbro] Sandin in 1973-75, were compared with a similar number of matched control patients, who had been admitted to other wards of Säter hospital [in Sweden]. Sandin's patients were better by all measures.' গ্রন্থ.5, পৃষ্ঠা.120.

63. 'And here we see these people in San Francisco and at Säter without previous psychiatric training. Working under difficult circumstances they beat the results of established psychiatry.' গ্রন্থ.5, পৃষ্ঠা.122.

64. 'We have found that neurotic disorders tend to be self-limiting, that psychoanalysis is no more successful than any other method, and that in fact all methods of psychotherapy fail to improve on the recovery rate obtained through ordinary life experiences and non-specific treatment.' গ্রন্থ.7, পৃষ্ঠা.721.

65. 'Both [Chlorpromazine and reserpine] are liable to produce undesirable side effects;.....Both can induce a Parkinson-like syndrome. Neither has been found to be of much use in the treatment of outpatients in this country, nor have the tranquillizers such as Meprobamate and benactyzine proved to be very effective in their treatment.' গ্রন্থ.6, পৃষ্ঠা.682.

66. 'The reader may like to judge after consulting a recent paper by Little (1958), containing an account of a well-controlled "double-blind comparison of the effects of chlorpromazine, barbiturate and a *placebo* in one hundred and forty-two chronic psychotic in-patients." There were no significant differences between the three treatments.' গ্রন্থ.6, পৃষ্ঠা.683.

67. 'With the exception of the dimensional hypothesis outlined at the beginning, little in the way of general descriptive or causal relationship between personality and drug effect has emerged.' গ্রন্থ.6, পৃষ্ঠা.683.

68. '[Davis and Cole in S.Arietti (ed.), *American Handbook of Psychiatry*, 1975, concludes:] "Thus about fifty percent of a moderately ill population of chronic, hospitalized schizophrenics will relapse *within six months after discontiuance of drug therapy....... The corollary is equally true, namely, fifty percent do not relapse*. Thus, half of this patient population *are taking drugs they do not need*."' গ্রন্থ.19, পৃষ্ঠা.227.

69. '...[Fortunately] for the physician, statistics are also on his or her side, for they reveal that, in as many as 70 to 80% of all cases, and educated guess is good enough. This is due primarily to the fact that most ailments tend to disappear on their own, given enough time, even if they go untreated, and, in some instances *in spite of* (rather than *because of*) the prescribed treatment. In many ways, the human body is designed and well-equipped to heal itself, so, in a sense, the medical practitioner is "buying time" is his or her first volley against the symptoms of a physical ailment, expecting that the organism will soon take care of itself, anyway...... *Always*, there is a great deal of trial and error involved—and a little bit of luck! Indeed, so much of medicine is still an art, not a science.' গ্রন্থ.13, পৃষ্ঠা.490.

70. 'While drugs are efficacious in controlling positive symptoms, they may not really aid the patient in coping with the illness and its social consequences. Involving the patient in his own recovery process could therefore herald a major breakthrough in his recovery process.' গ্রন্থ.28, পৃষ্ঠা.17.

71. 'Much of the research in the area of coping has come from the west....... There have been relatively few studies on the subject of coping in India.' গ্রন্থ.28, পৃষ্ঠা.17-18.

72. 'This study [in a sample of 50 patients diagnosed as schizophrenic with a duration of illness of 2 years or more] revealed that schizophrenic patients used a wide array of coping strategies to deal with their disturbances....... Recent literature and the personal experience of the investigators in the area of coping in schizophrenia, has brought to light the fact that schizophrenic patients are not totally devoid of insight or insensitive to changes taking place within themselves especially when they are in a state of remission.' গ্রন্থ.28, পৃষ্ঠা.22.

73. 'No doubt the problem of suicide is a most complex one, and no single factor can be assumed to be *the* cause. But even without entering at this point into a discussion of suicide, I consider it a safe assumption that a high suicide rate in a given population is expressive of a lack of mental stability and mental health.' গ্রন্থ.10, পৃষ্ঠা.16.

74.

COUNTRY	*SUICIDE* (Per 100,000 of adult population)
Denmark	35.09
Switzerland	33.72

Finland	...	...	23.35
Sweden	...	...	19.74
United States	...	...	15.52
France	...	...	14.83

[World Health Organization (1951, 1952)] গ্রন্থ.10,পৃষ্ঠা.17 Table I.

75. 'The aim of the whole socio-economic development of the Western world is that of the materially comfortable life, relatively equal distribution of wealth, stable democracy and peace, and the very countries which have come closest to this aim show the most severe signs of mental unbalance! It is true that these figures in themselves do no *prove* anything, but at least they are startling.' গ্রন্থ.10,পৃষ্ঠা.19.

76. 'A ban of neuroleptic drugs is the most direct and obvious conclusion from all that has been said here..... The history of psychiatry is frightening. It is easier to see the evil of past therapeutic practices than to see the evil of today's methods.... The neuroleptic drug tragedy, involving many more people, is however a disaster unequalled in the history of psychiatry.' গ্রন্থ.5, পৃষ্ঠা.136-7.

77. 'Any mentally disabled person, just as any other patient undergoing treatment for his disability, should be accorded respect for his human dignity. To as full an extent as possible, a patient should be advised of recommended treatment, including an explanation of what can be expected from the treatment and what both its beneficial and adverse consequences are.' গ্রন্থ.17,পৃষ্ঠা.217.

78. 'Symptoms of psychological distress need not be evidence of inadequacy, but they may be appropriate responses to external pressures.' গ্রন্থ.18,পৃষ্ঠা.220.

79. 'What we now call mental illness would be reconceived primarily as response to stress—the stress of one or another factor in the social environment.' গ্রন্থ.18,পৃষ্ঠা.222.

80. 'Whilst the status of psychiatry within medicine was reinforced by the translation of the Royal Medico-Psychological Association into the Royal College of Psychiatrists in 1971, repeated scandals about the treatment of patients in particular hospitals, the uneven development of community services, and only limited advance beyond pre-1959 therapeutic technologies combined to depress public confidence. Psychiatry's mission to medicalize madness was faced with serious theoretical challenges—philosophical, sociological, and historical—which far exceeded the effectiveness of the protestations of earlier outlets for unease such as the National Society for Lunacy Reform.' গ্রন্থ.20,পৃষ্ঠা.350-1.

81. 'In Britain, the main exponents of Anti-Psychiatry were R.D.Laing and David Cooper, who were both medically qualified psychiatrists...... Overtly political organizations of patients were formed with programmes related to this analysis: in Britain the Mental Patients Union pledged itself to 'challenge repressive psychiatric practice and its ill-defined concepts of "mental illness"' and proclaimed that 'psychiatry is one of the tools that capitalism uses to ensure that frustation and anger against the repressive system is internalized'. Counterparts of this organiztion included in the United States the Mental Patients Liberation Front, and in West Germany the Socialist Patients' Collective, founded by Baader-Meinhof anarchists at Heidelberg University in 1972.' গ্রন্থ.20,পৃষ্ঠা.344-6.

গ্রন্থপঞ্জী

1. Thomas S.Szasz : *The Myth of Mental Illness : Foundation of a Theory of Personal Conduct* (Secker & Warburg, London, 1962).

2. Raziel Abelson : 'The Myth of Mental Science', প্রবন্ধ সংকলন Elsie L. Bandman and Benram Bandman (সম্পাদক) : *Bioethics and Human Rights* (Little, Brown, 1977), পৃষ্ঠা.233-236.

3. Thomas S. Szasz : *Ideology and Insanity : Essays on the Psychiatric Dehumanization of Man* (Penguin, Harmomdsworth, 1974).

4. Malcom Lader : *Psychiatry on Trial* (Penguin, Harmondsworth, 1977).

5. Lars Mårtensson : 'Should Neuroleptic Drugs be Banned?', প্রবন্ধ সংকলন Knud Jensen and Bent Pedersen (সম্পাদক) : *Commitment and Civil Rights of the Mentally Ill* (SIND, Copenhagen, 1985), পৃষ্ঠা.112-145.

6. D.Trouton and H.J.Eysenck : 'The Effects of Drugs on Behaviour', প্রবন্ধ সংকলন H.J.Eysenck (সম্পাদক) : *Handbook of Abnormal Psychology : An Experimental Approach* (Basic Books, New York, 1961), পৃষ্ঠা.634-696.

7. H.J.Eysenck : 'The Effects of Psychotherapy', প্রবন্ধ সংকলন H.J.Eysenck (সম্পাদক) : *Handbook of Abnormal Psychology : An Experimental Approach* (Basic Books, New York, 1961), পৃষ্ঠা.697-725

8. Harold I. Kaplan and Benjamin J. Sadock : *Pocket Handbook of Psychiatric Drug Treatment* (Waverly International, Baltimore, Indian edn, B.I.Publication, New Delhi, 1993).

9. Linford Rees : *A Short Textbook of Psychiatry* (ELBS and Hodder & Stoughton, Suffolk, 1984).

10. Erich Fromm : *The Sane Society* (Fawcett Premier, New York, reprint 1987).

11. Gregory Zilboorg : *Mind, Medicine, & Man* (Harcourt Brace, New York, 1943)

12. Edwin M.Schur : "Psychiatrists under Attack: The Rebellious Dr. Szasz", *The Atlantic*, June 1966, pp.72-76.

13. Daniel J. Schneck : *Engineering Principles of Physiologic Function* (New York University, New York, 1990).

14. Government of India : 'The Indian Lunacy Act, 1912', সংকলন N.D.Basu (সম্পাদক) : *The Annoted Indian Criminal Court Hand Book*, Vol.I (Eastern Law House, Calcutta, 1932), পৃষ্ঠা.973-1017.

15. Government of India : *The Mental Health Act, 1987* (Ministry of Law and Justice, Delhi,1988)

16. Hildegard E. Peplau : 'The Right to Change Behavior : Rights of the Mentally Ill', প্রবন্ধ সংকলন Elsie L. Bandman and Benram Bandman (সম্পাদক) : *Bioethics and Human Rights* (Little, Brown, 1977), পৃষ্ঠা.207-212.

17. June Resnick German : 'Legal Rights of the Mentally Disabled', প্রবন্ধ সংকলন Elsie L. Bandman and Benram Bandman (সম্পাদক) : *Bioethics and Human Rights* (Little, Brown, 1977), পৃষ্ঠা.213-218.

18. Angela Barron McBride and William Leon McBride : 'Social Environment as the Basis for Discerning Mental Disability : The Effects of a New Paradigm on Patients' Rights', প্রবন্ধ সংকলন Elsie L. Bandman and Benram Bandman (সম্পাদক) : *Bioethics and Human Rights* (Little, Brown, 1977), পৃষ্ঠা.219-223.

19. Elsie L. Bandman : 'The Right of the Mentally Ill to Refuse Treatment', প্রবন্ধ সংকলন Elsie L. Bandman and Benram Bandman (সম্পাদক) : *Bioethics and Human Rights* (Little, Brown, 1977), পৃষ্ঠা.224-232.

20. Clive Unsworth : *The Politics of Mental Health Legislation* (Clarendon Press, Oxford, 1987).

21. Philip Bean : *Compulsory Admissions to Mental Hospitals* (John Wiley, Chichester, 1980). 22. Knud Thomsen : 'Opening Address', প্রবন্ধ সংকলন Knud Jensen and Bent Pedersen (সম্পাদক) : *Commitment and Civil Rights of the Mentally Ill* (SIND, Copenhagen, 1985), পৃষ্ঠা.20-21.

23. Hans Wiegant : 'Clients' Participation in Psychiatric Hospitals in the Netherlands', প্রবন্ধ সংকলন Knud Jensen and Bent Pedersen (সম্পাদক) : *Commitment and Civil Rights of the Mentally Ill* (SIND, Copenhagen, 1985), পৃষ্ঠা.278-283.

24. David Sanders with Richard Carver : *The Struggle for Health : Medicine and the Politics of Underdevelopment* (Macmillan, Hampshire, 1985).

25. Gabriel Cohn-Bendit and Daniel Cohn-Bendit : *Obsolete Communism : The Left-Wing Alternative* (Penguin, 1969).

26. Peter Dally : 'The Present Status of Psychotropic Drugs', *The Practitioner*, September 1970, পৃষ্ঠা.307-312.

27. Jozef Ph. Hes : 'What kinds of patient ought to be befriended during or after psychiatric treatment?', প্রবন্ধ সংকলন The Samaritans (সম্পাদক) : *Answers to suicide* (Constable, London, 1978), পৃষ্ঠা.59-62.

28. Shuba Kumar and Thara Srinivasan : 'Coping Behaviour in Schizophrenia', *Indian Journal of Social Psychiatry*, 8(1-2), 1992, পৃষ্ঠা.17-23.

29. Knud Jensen and Bent Pederson : 'Forward', প্রবন্ধ সংকলন Knud Jensen and Bent Pedersen (সম্পাদক) : *Commitment and Civil Rights of the Mentally Ill* (SIND, Copenhagen, 1985), পৃষ্ঠা.20-21.

নিউরোলেপটিক্ ড্রাগ কি নিষিদ্ধ হওয়া উচিত ?

লার্স মার্টেনসন

Commitment and Civil Rights of the Mentally Ill (SIND, Copenhagen, 1985) সংকলন গ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধ Should Neuroleptic Drugs be banned ?-এর সংক্ষেপিত অনুবাদ

বছর ত্রিশ আগে নিউরোলেপটিক্ ড্রাগ আবিস্কারের পর থেকে এ পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ মানুষের উপর এই ওষুধ প্রয়োগ করা হয়। পঁচাশি লক্ষ মানুষের দেশ সুইডেনে প্রতিদিন প্রায় এক লক্ষ মানুষ ওই ওষুধ ব্যবহার করেন। এঁদের এক তৃতীয়াংশ স্কিজোফ্রেনিয়ার রোগী। অন্যান্যদের বড় অংশ হলেন জড়বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এবং বৃদ্ধাশ্রমের দিশাহারা ও বিষণ্ণ বৃদ্ধ-বৃদ্ধরা।

নিউরোলেপটিক্ ড্রাগ যাঁদের নিতে হয়, তাঁদের মধ্যে কয়েকটা সাধারণ মিল লক্ষ্য করা যায়। এঁরা সকলেই দেশের সন্তান, এঁরা ক্ষমতাহীন ও প্রতিবাদে অক্ষম, চারপাশের মানুষদের এঁরা নানা সমস্যায় ফেলেন। এইসব সমস্যা কম করতে বা দূর করতেই ওযুধের প্রয়োগ করা হয়। নিউরোলেপটিক্ ড্রাগের প্রধান প্রয়োগের ক্ষেত্র স্কিজোফ্রেনিয়ার চিকিৎসায়। তাই এই ওযুধকে এ্যান্টি-স্কিজোফ্রেনিয়া বা এ্যান্টি-সাইকোটিক্ ড্রাগও বলা হয়।

সাইকিয়াট্রিতে হালের যে বিপ্লব, তার পুরো কৃতিত্বটাই নিউরোলেপটিক্ ড্রাগকে দেওয়া হয়। স্কিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্তদের ক্ষেত্রে এই ওযুধ প্রভূত উপকার ঘটিয়েছে বলে সাধারণভাবে ভাবা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ওযুধে তাঁদের উপকার তো হয়ই না, বরং অপরিমেয় ক্ষতিই হয়। ক্ষতি হয় দুভাবে। প্রথমত ওযুধ মস্তিষ্ক এবং মানসিক ফাংশান্‌গুলির সরাসরি ক্ষতিসাধন করে। দ্বিতীয় ওযুধের প্রয়োগের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত থাকে মানুষ এবং মানুষের সমস্যা সম্পর্কে কতকগুলো ভ্রান্ত ও জঘন্য ধারণা।

স্কিজোফ্রেনিয়া একটা মেডিক্যাল সমস্যা যার মেডিক্যাল সমাধান আছে—অসুখটি সম্পর্কে এমনই একটা ভুল ধারণাকে তুলে ধরেছে নিউরোলেপটিক্ ড্রাগ। আমাদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করা থেকেও বিরত রাখছে এ ওযুধ। ফলে স্কিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত মানুষেরা পরিত্যক্ত হয়ে পড়ছেন। এটাই তাঁদের দুঃখের আসল কারণ। পরিত্যক্ত না হলে, তাঁদের অনেকেই, বিশেষ করে যুবা ও প্রতিভাবানেরা, আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মত জীবনের অনেক সমস্যা ও সম্ভাবনাকে বুঝতে সক্ষম হতে পারতেন।

এই প্রবন্ধের তিনটি অংশ রয়েছে। প্রথম অংশে রয়েছে নিউরোলেপটিক্ ড্রাগ ও স্কিজোফ্রেনিয়া নিয়ে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণার কথা। আরও আছে এদের প্রত্যেকটির পক্ষে বিপক্ষে যুক্তি ও সমালোচনার উল্লেখ। নিউরোলেপটিক্ ড্রাগ মস্তিষ্ক ও ব্যক্তিত্বকে কিভাবে প্রভাবিত করে, তা নিয়ে তৈরি দ্বিতীয় অংশটি। নিউরোলেপটিক্ ড্রাগের প্রয়োগের আরও কিছু দুঃখজনক ঘটনার বিবরণ ও এই সম্পর্কিত বিষয়ে আইনের কেমন ধরণের পরিবর্তন জরুরী হয়ে পড়েছে তার আলোচনা বা সিদ্ধান্তগুলি তৃতীয় অংশে।

প্রথম অংশ : নিউরোলেপটিক্ ড্রাগ ও স্কিজোফ্রেনিয়া বিষয়ে তিনটি ধারণা

স্কিজোফ্রেনিয়ায় নিউরোলেপটিক্ ড্রাগের ব্যবহার সম্বন্ধে আমি তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণার কথা বলব ঃ

(এক) ভয়াবহ ও অবশ্যম্ভাবী মস্তিস্কের ক্ষতি।

(দুই) নিউরোলেপটিক্ ড্রাগের সাময়িক ব্যবহার—একটি ফাঁদ।

(তিন) কয়েক বছর পরের ড্রাগ-ফ্রি অবস্থায়, সমস্ত লক্ষণের বিচারে রোগীদের উন্নতি দেখা যায়।

উপরের ঘটনাগুলি, সাইকিয়াট্রিক চিকিৎসায় দ্রুত ও মৌলিক পরিবর্তনের দাবি তোলে। এই পরিবর্তনগুলি সাইকিয়াট্রি'র ভিতর থেকে আসবে না। এর জন্য চাই বলিষ্ঠ রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও শক্ত আইন।

এক) ভয়াবহ ও অনিবার্য মস্তিস্কের ক্ষতি

দীর্ঘকাল ধরে নিউরোলেপটিক্ ড্রাগ ব্যবহারের ফলে অসংখ্য মানুষ যে *টার্ডিভ ডিস্কাইনেসিয়া* (tardive dyskinesia) 'য় ভোগে, তা সুবিদিত। টার্ডিভ ডিস্কাইনেসিয়া হল মোটর কোঅর্ডিনেশনের (motor co-ordination) স্থায়ী বিশৃঙ্খলা।

জিভ, চোয়াল ও মুখমন্ডলের অনৈচ্ছিক পেশী নড়াচড়ায় এই বিশৃঙ্খলার লক্ষণগুলি দৃষ্টিগোচর হয়।

সব রোগীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা : যদি একদল রোগীর এক তৃতীয়াংশের মধ্যে মোটামুটি মোটর বিশৃঙ্খলার লক্ষণগুলি দেখা যায়, তাহলেই আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, বাকিদের অধিকাংশ অথবা সম্ভবত সকলেই বিশৃঙ্খলার শিকার। যখন একটা মস্তিষ্ক ব্যবস্থা ধীরে ধীরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন অনেকটা ক্ষতি হওয়ার পরেই মস্তিষ্কের ফাংশান ক্লিনিক্যালি (clinically) অসংলগ্ন হয়ে পড়ে। মুখমন্ডলের টার্ডিভ ডিস্কাইনোসিয়া এবং শারীরিক গতিবিধি ও ভঙ্গিমায় মোটামুটি অসংলগ্নতা আসার অনেক আগে থেকেই, রোগীরা তাঁদের চলাফেরার স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্য ও উৎকর্ষ হারাতে থাকেন।

অন্যান্য মোটর বিশৃঙ্খলা (motor disorders) : টার্ডিভ ডিস্কাইনেসিয়াকেই বিশেষ করে ভয়াবহ মনে হতে পারে; কারণ এজাতীয় বিশৃঙ্খলা সচরাচর দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং ওষুধের প্রয়োগ বন্ধ হওয়ার পরেও থেকে যায়। অন্যান্য মোটর বিশৃঙ্খলাগুলি ওষুধ-সেবনকারীর শরীরের সমস্ত পেশীর সংগে যুক্ত। ওষুধের ব্যবহার বন্ধ হলে, এই বিশৃঙ্খলাগুলিও চলে যায়। কিন্তু বাস্তবে এরা আরও মারাত্মক। এই মোটর বিশৃঙ্খলাগুলি হল পারকিন্সনিজম্ (Parkinsonism) একাথাইসিয়া (Akathisia) এবং একাইনেসিয়া (Akinesia)।

সম্ভাব্য চূড়ান্ত ওষুধ প্রয়োগজনিত ক্ষতি : অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে স্কিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত কোন যুবককে যদি প্রথমেই নিউরোলেপটিক্ ড্রাগ দেওয়া হয়, তাহলে সে দীর্ঘসময় ধরে অথবা সারা জীবন ধরেই ওষুধটি নিয়ে থাকে। কিন্তু যদি প্রথমেই এজাতীয় ওষুধ প্রয়োগ করা না হয়, তবে ওষুধের উপর স্থায়ী নির্ভরশীলতার নিয়তিকে এড়ানো যায়। স্কিজোফ্রেনিয়ার চিকিৎসায় নিউরোলেপটিক্ ড্রাগ কোন রোগীরউপর প্রথম প্রয়োগের আগে, ওষুধের সম্ভাব্য চূড়ান্ত ক্ষতি তার ক্ষেত্রে কি হতে পারে, সে বিচার অবশ্যই করা উচিত। পরে আমরা ওষুধ কিভাবে ফাঁদের কাজ করে, তার ফার্মাকোলজিক্যাল (Pharmacological) ও সাইকোলজিকাল (psychological) কারণগুলো খুঁজে দেখব। বাস্তবে যদি ওষুধের প্রয়োগ বন্ধই না হয়, তাহলে ওষুধের ব্যবহারের ফলে স্থায়ী ক্ষতি আর ওষুধের প্রয়োগ বন্ধের সাথে বিলীন-হয়ে-যাওয়া অস্থায়ী ক্ষতির মধ্যে তফাৎটুকু গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে।

মস্তিকে নিউরোলেপটিক্ ড্রাগের আরও লক্ষ্য বস্তু : এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা মোটর কোঅর্ডিনেশনের জন্যই মস্তিষ্ক ব্যবস্থাকে দেখছিলাম। মস্তিষ্কে নিউরোলেপটিক্ ড্রাগের আরও দুটো লক্ষ্য বস্তু হল হরমোন কন্ট্রোল্ সিস্টেম (hormone control system) এবং লিম্বিক্ সিস্টেম (limbic system)। স্ত্রীরোগীদের ঋতুস্রাবের বা স্তনদুগ্ধের নিঃসরণে অস্বাভাবিকতায় হরমোন্ কন্ট্রোল্ সিস্টেমে ওষুধের প্রভাবের অনিবার্য লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়।

লিম্বিক সিস্টেম : নিউরোলেপটিক্ ড্রাগের প্রধান ও অভীষ্ট লক্ষ্য বস্তু হল লিম্বিক সিস্টেম। এই ব্যবস্থাই আবেগ, দেহের ভিতরকার পরিবেশের নিয়ন্ত্রণ ও উপলব্ধি, যৌনতা প্রভৃতির কেন্দ্রস্থল। নিউরোলেপটিক্ ড্রাগের যে তথাকথিত এ্যান্টি-সাইকোটিক্ বৈশিষ্ট্য, তা আসলে লিম্বিক ব্যবস্থার উপর ওষুধের প্রভাবেরই ফলশ্রুতি। মোটর কোঅর্ডিনিশেন সিস্টেমের ক্ষতি ভীষণ সুস্পষ্ট, কেননা তা দেখা যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে পরিমাণও করা যায়। লিম্বিক সিস্টেমের ক্ষতি নিশ্চিতভাবে আরও মারাত্মক, কারণ এই ক্ষতি মানেই আবেগের ও সর্বোচ্চ মানসিক ফাংশানের বিপর্যয়। আমরা পরে, বিশেষ করে, লিম্বিক সিস্টেম ও প্রিফ্রন্টাল্ কোর্টেক্স্ (proforntal cortex)-এর মধ্যেকার সম্পর্কের আলোচনা করব।

মস্তিকের ক্ষতি হিমশৈলের চূড়া : এই পর্যন্তের আলোচনা এই সিদ্ধান্তের পক্ষে যথেষ্ট যে টার্ডিভ ডিস্কাইনেসিয়া বলতে যে বড়সড় মেডিক্যাল বিপর্যয়কে বোঝায়, তা আসলে নিউরোলেপটিক্ ড্রাগের দ্বারা সংঘটিত মস্তিষ্কের ভয়াবহ ক্ষতির হিমশৈলের চূড়াটিমাত্র।

দুই) নিউরোলেপটিক্ ড্রাগের সাময়িক ব্যবহার আসলে ফাঁদ

আমরা সকলেই জানি একজন সাইকোটিক্ ব্যক্তি কি ধরণের সমস্যার উৎস হন। ফলে কেউ যখন "মারাত্মক পরিস্থিতির সময়ে" ওষুধের প্রয়োজনের কথা বলেন তখন তার যুক্তিগ্রাহ্য বলেই বোধ হয়। কিন্তু সেই সুপারিশ প্রতারণামূলক না হলেও, সন্দেহজনক তো বটেই। একথা ফারমাকোলজিক্যাল ও সাইকোলজিক্যাল উভয় কারণবশতই গ্রাহ্য।

সাইকোলজিক্যাল কারণ সমূহ : 'হার্ভার্ড গাইড টু মডার্ন সাইকিয়াট্রি' (ডে এ্যান্ড সেমরাড 1978[1]) শীর্ষক পুস্তকটি সাবধান করে বলে, "দ্রুত ওষুধাশ্রিত হয়ে পড়ার ব্যাপারটা রোগীকে বোঝায় যে তাঁর সকল প্রয়োজন মিটবে না।" অন্য কথায়, তাঁর যে জিনিসটার খুবই দরকার, অর্থাৎ আশা, তা

থেকে তাঁকে বঞ্চিত করে ওষুধ। এটা অনিবার্যভাবে সত্যি যে স্কিজোফ্রেনিয়া হল আশাহীনতা, এবং উল্টোভাবে, যে মানুষের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় আশা বিরাজমান, সে স্কিজোফ্রেনিক নয়। কারুর সাইকোটিক সমস্যার সময়ে অন্যান্যদের তার পাশে এগিয়ে আসা উচিত সাহস, দূরদৃষ্টি, ধৈর্য, সহনশীলতা ও সমর্থন নিয়ে। আর, রোগীরও প্রয়োজন তার নিজের মস্তিষ্কের পূর্ণ অটুটত্ব! কঠিন গুরুত্বপূর্ণ কাজটি এখন করা চাই।

যদি সাইকোসিসের (psychosis) সমস্যা ওষুধ ছাড়াই মেটানো যায়, তাহলে রোগীর নিজের উপর ও অন্যান্যদের উপর বিশ্বাস বেড়ে যায়। আত্মপ্রত্যয়, আত্মমূল্য সংক্রান্ত ভাবনা (feeling of self-worth) এবং অন্যান্য মানুষের উপর বিশ্বাস—তিনটি জিনিসেরই তাঁর নিশ্চিত প্রয়োজন হয় ধীরে ধীরে স্কিজোফ্রেনিয়ার কবলমুক্ত হওয়ার জন্য। কিন্তু যদি ওষুধ ব্যবহার করা হয়, তাহলে তিনি উল্টো শিক্ষাই পাবেন এবং বেশী বেশী করে ওষুধ-নির্ভরতার পথে হাঁটতে শুরু করবেন।

ফারমাকোলজিক্যাল কারণ সমূহ : এই ক্রম-বর্ধমান ওষুধ-নির্ভরতার মারাত্মক রাস্তায় রোগীকে দাঁড় করানোর পিছনে ফারমাকোলজিক্যাল কারণ আছে। নিউরোলেপটিক্ ড্রাগগুলি লিম্বিক সিস্টেমে নির্দিষ্ট কিছু পরিবর্তন ঘটায় যাতে একজন মানুষ আরও সাইকোসিস্-প্রবণ (psycosisprone) হয়ে পড়েন। এটা যেন অনেকটা মস্তিষ্কের মধ্যে সাইকোসিস সৃষ্টিকারী এজেন্ট্ (psycosis inducing agent) পুরে নেওয়ার মত ব্যাপার।

যদি ওষুধের প্রয়োগ বন্ধ করা হয়, তাহলে সময়ের সাথে নিউরোলেপটিক্ ড্রাগের প্রভাবও কম বেশী মিলিয়ে যেতে পারে। কিন্তু তখন অনেকটাই দেরী হয়ে যায়। ওষুধের প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট সাইকোটিক্ লক্ষণগুলি দেখে সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়ে গিয়ে থাকে, "রোগীর ওষুধ দরকার।" ফাঁদ তাই বাস্তব সত্য।

ড্রাগ ও সাইকোথেরাপীর সমন্বয় : চিকিৎসকেরা ওষুধ ও সাইকোথেরাপীর সমন্বয়ের সুপারিশ করতে পারেন। যেকোন সমঝোতার মতই, এই সুপারিশও বেশ যুক্তিগ্রাহ্য মনে হতে পারে। কিন্তু এই প্রস্তাবও প্রতারণামূলক না হলেও সন্দেহজনক। চিকিৎসকের আসল উদ্দেশ্য হতে পারে সচেতন বা অসচেতনভাবে তিনি দ্রুত ও সহজ সমাধান চাইছেন, এবং তা রোগীর প্রকৃত স্বার্থের বিনিময়ে।

মনোরোগীরা সাধারণের চেয়ে অসাধুতায় অনেক বেশী সংবেদনশীল। তাই উপরোক্ত দাওয়াই তাঁদের কাছে দ্বিচারিতার মত বোধ হতে পারে এবং তাঁদের মনের সংযমের বাঁধ আলগা হয়ে যায়।

এক্ষেত্রে একথা বলা দরকার যে যদি চিকিৎসক, রোগী ও আত্মীয়েরা কঠিন সংকটের সময়ে সবদিক বিবেচনা করে ওষুধ প্রয়োগকেই সব চেয়ে উপযোগী পন্থা হিসাবে সিদ্ধান্ত নেন এবং এই সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে তাঁরা যদি সমস্ত সমস্যাগুলিকে খতিয়ে দেখে থাকেন, তাঁদের উদ্যোগ যদি একনিষ্ঠ ও দায়িত্বশীল হয়ে থাকে, তাহলে বাইরের কেউ কোন রায় দিতে পারে না। সব থেকে দুঃখের ঘটনা হল তাঁরা খুব সম্ভব একটা ভুল সিদ্ধান্ত নেন এবং এর কারণ হিসাবে কাজ করছে সাইকিয়াট্রি-সংক্রান্ত ভুল তথ্য।

সুতরাং এই বিপদগুলি সম্বন্ধে সাবধান করা খুব প্রয়োজনীয়। স্বল্পকালীন ওষুধ-নির্ভর চিকিৎসার দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থায় পরিণত হওয়াটাকে এড়ানো ভীষণ কঠিন এবং এর সাথে অঙ্গীভূত থাকে ব্যক্তিত্বের অবনতি (personality deterioration) এবং সময়ের সাথে বৃদ্ধি পেতে থাকে মস্তিষ্কের ক্ষতি। এসব সম্বন্ধে সাবধানবাণী প্রচারের দরকার রয়েছে।

তিন) কয়েক বছর পর ড্রাগ-ফ্রী প্রোগ্রামে (drug-free program) সব দিকের বিচারে রোগীর উন্নতির লক্ষণ

সাইকোটিক লক্ষণগুলির বিরুদ্ধে ওষুধের কার্যকারিতা : অসংখ্য সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে যে সাইকোটিক্ লক্ষণগুলি নিউরোলেপটিক ড্রাগ ব্যবহারের ফলে হ্রাস পায়। একথাও বলা হয়েছে যে ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা বজায় রাখলে, উপসর্গগুলির পুনরাক্রমণের ঝুঁকি (risk of relapse) অনেক কমে যায়। সমস্ত প্রকারের নিউরোলেপটিক ড্রাগের পক্ষে এই কথাগুলির প্রমাণ স্বরূপ প্রকাশিত হজার হাজার রিপোর্ট।

কার্যকরী ওষুধ, কিন্তু রোগীর ক্ষেত্রে ক্ষতিকর : একটি সরল থট্ এক্স্পেরিমেন্ট্ (thought experiment)-এর সাহায্যে দেখানো যায়, ওষুধ উপসর্গগুলির ক্ষেত্রে যতই কার্যকর হোক না কেন, রোগীর ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক হতেই পারে। ছোট শিশুদের নিউরোলেপটিক্ ড্রাগ দিন। ফল স্বরূপ তার কান্না ও সমস্যাদায়ী আচরণ কম হবে, অথবা একাবারেই থাকবে না। যদি এই অবস্থা বজায় থাকার ওষুধ (maintenance drug) দেওয়া হয়, তাহলে কান্না ও সমস্যাদায়ী আচরণগুলির পুনরায় ফিরে

আসার ঝুঁকিও অনেক কমবে। এইভাবে ওষুধ প্রয়োগে শিশুদের অবস্থার "উন্নতি" বা "আরোগ্য" সম্ভব। ওষুধ যদিও "কার্যকরী", কিন্তু আমাদের শিশুদের তা যে কোন মঙ্গল করে না, এটা বুঝতে কোন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের দরকার নেই। *কয়েক বছর পর ড্রাগ-ফ্রী প্রোগামে শিশুরা যে সবদিকের বিচারে ভাল থাকবে, তা আমরা দৃঢ়ভাবে অনুধাবন করি।* একই কথা একই কারণে স্কিজোফ্রেনিক রোগীদের বেলাতেও প্রযোজ্য।

এখন, আসুন, আমরা তিনটি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের দিকে দেখি যেগুলি আমাদের তৃতীয় বিবৃতিটিকে সমর্থন করে। যেহেতু সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ ধর্মী আলোচনার পরিসর এখানে নেই। তাই মুখ্য তথ্যগুলিকেই তুলে ধরা হবে।

(ক) পারিবারিক পরিবেশ (family environment) : যেসব স্কিজোফ্রেনিক রোগী পরিবারের মধ্যে, অর্থাৎ মা-বাবা অথবা স্বামী-স্ত্রীর সংগে থাকে, তাদের ক্ষেত্রে পুনরাক্রমণের হার নিয়ে ব্রিটিশ গবেষকরা কাজ করেছেন। বাড়ীতে এইসব রোগীর আবেগের অবস্থা (emotional situation) সহায়ক অথবা অসহায়ক (favourable or unfavourable) এই দুইভাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। অন্যতম গবেষক জুলিয়ান পি. লেফ্ (1976[2]), "স্কিজোফ্রেনিয়া এবং পারিবারিক পরিবেশের প্রতি সংবেদনশীলতা" শিরোনামের নিবন্ধে এই গবেষণাগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। নীচের সারণীতে যে শতকরা হার রয়েছে, তা হল পুনরাক্রমণের হার, অর্থাৎ চারটি শ্রেণীর প্রতিটিতে শতকরা কতজন রোগীর সাইকোসিসের পুনরাক্রমণ ঘটল তার মাত্রা।

	ওষুধ না-দেওয়া রোগী	ওষুধ-প্রাপ্ত রোগী
সহায়ক আবেগের অবস্থা	15%	12%
অসহায়ক অবস্থা	92%	53%

'ক্ষতিকর' পরিবেশে ওষুধ-প্রাপ্ত রোগীরা, 'ভাল' পরিবেশের ওষুধ না-নেওয়া রোগীদের থেকে প্রায় তিনগুণেরও বেশী মাত্রায় (53%-এর তুলনায় 15%) পুনরাক্রমণের শিকার হন। ভাল পরিবেশে ওষুধের প্রয়োগ পুনরাক্রমণের ঝুঁকির উপর তেমন কোন প্রভাব ফেলে না। এই গবেষণা গুলি প্রমাণ করে স্কিজোফ্রেনিক রোগীদের জন্য মস্তিকের ক্ষতিকর নিউরোলেপটিক্ ড্রাগের দরকার নেই ; প্রয়োজন জীবনের একটি অবস্থার (life situation) যেখানে তাঁরা বাঁচতে ও বিকশিত হতে পারেন।

(খ) সানফ্রানসিস্কোর সোটেরিয়া প্রকল্প (Soteria Project)[3] : সানফ্রানসিস্কো অঞ্চলে সোটেরিয়া বাড়ীটি ছিল আপন গৃহের মতই একটি আবাসস্থল। অপেশাদার থেরাপীস্ট্রা এখানকার কর্মীবৃন্দ। ছয়জন করে রোগীর এখানে থাকার ব্যবস্থা ছিল। যুবক, সদ্য স্কিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্তরা এখানে ভর্ত্তি হতেন এবং প্রায় পাঁচমাস যাবৎ থাকতেন।

তারপর সোটেরিয়ার রোগীদের সংগে নিয়মিত সাইকিয়াট্রিক্ ক্লিনিকের একই রকম রোগীদের তুলনা করা হত। দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্তদের উপর স্বাভাবিকভাবেই নিউরোলেপটিক্ ড্রাগের প্রয়োগ হয়েছিল। সোটিরিয়ার রোগীদের সাধারণত ওষুধ দেওয়া হত না, বা হলেও তা ছিল যৎসামান্য।

সোটিরায়ায় বছর দুই কাটানোর পর, রোগীরা সকল সাইকিয়াট্রিক্ মাপকাঠির বিচারে কন্ট্রোল্ রোগীদের সমতুল্য বা তাদের থেকে ভাল হয়ে যেতেন। ছুটির 12 মাস পর, কন্ট্রোল্ রোগীদের প্রায় 60 শতাংশের ক্ষেত্রে যেখানে পুনরাক্রমণ ঘটে, সেখানে সোটেরিয়া রোগীদের ক্ষেত্রে এই মাত্রা 30 শতাংশের মত। এটা পরিস্কার যে সোটেরিয়ার রোগীদের ক্ষেত্রে পুনরাক্রমণের ঝুঁকি অনেক কম।

(গ) সুইডেনের সাতার প্রকল্প (Sater Project) : সাতের দশকের (1970's) প্রথম দিকে বার ব্রো সানডিন্ নামে সবে চল্লিশোর্ধ এক মহিলা সাতার হাসপাতালে সাময়িক কর্মী হিসাবে নিযুক্ত হলেন। তিনি ছিলেন গৃহবধু ও সন্তানের জননী। একজন ওষুধ-প্রাপ্ত (drugged), উদাসীন, যুবক স্কিজোফ্রেনিয়ার রোগীর দুঃখে বিচলিত হয়ে তিনি তাঁকে নিজের বাড়ী নিয়ে যান। কয়েক বছর পর যুবকটির রোগমুক্তি ঘটে এবং সে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে।

একটি ছোট পরীক্ষাধীন ওয়ার্ডের দায়িত্ব ব্রো সানডিনকে দেওয়া হয় এবং তিনি সামান্য কয়েকজন সহকর্মীকে নিয়ে 1973 থেকে সেখানে বেশ কিছু যুবক স্কিজোফ্রেনিয়ার রোগীর মূলত ওষুধ ছাড়াই পরিচর্যা করতেন।

1973 থেকে '75-এর মধ্যে সানডিনের কাছে সাইকোথেরাপী শুরু করেন, এমনই চোদ্দজন স্কিজোফ্রেনিয়ার রোগীর 1980 সালে সমান সংখ্যক একই পর্যায়ের কন্ট্রোল্ রোগী (matched control patients) সাথে তুলনা করা হয়। এই শেযোক্তরা সাতার হাসপাতালের অন্যান্য ওয়ার্ডে ভর্ত্তি ছিলেন (জোস্ট্রম, 1982[4])। সবরকম বিচারেই সানডিনের রোগীদের অবস্থা ভাল ছিল। 1980 সালে কন্ট্রোল্

রোগীরা যেখানে গড়ে জনপ্রতি পাঁচমাস বা তার বেশী হাসপাতালে ছিলেন, সেখানে সানডিনের রোগীগদের ক্ষেত্রে এই গড় ছিল একমাস বা সামান্য বেশী।

ওষুধ না-পাওয়া রোগীদের (non-drug patients) প্রথম দুই তিন বছর অধিক যত্ন ও মনোযোগের দরকার হয়েছিল। প্রথম দুই তিন বছর পর ওষুধ-পাওয়া রোগীদের অবস্থার অবনতি হতে থাকে, যখন ওষুধ না-পাওয়া রোগীদের অবস্থা ছিল ভালর দিকে।

'উন্নতি' এবং দীর্ঘমেয়াদী অবনতির আন্তঃসম্পর্ক :

নিউরোলেপটিক্ ড্রাগ রোগীদের শান্ত এবং বেদনাবোধহীন করে ; সাইকিয়াট্রিক্ হাসপাতালবাসের স্বল্প মেয়াদী ঝুঁকিকে (short-term risk) কম করে। উপসর্গগুলির কম হওয়ার কারণে, এই ধরণের শান্ত ও উদাসীন মানুষদের "উন্নতি" হয়েছে বলা হলে, তা বাস্তবে হয় ভাষার এক বিকৃত ব্যবহার। এইজাতীয় সংজ্ঞার (terminology) ক্ষেত্রে বিকৃতিকে বুঝাতে আমরা ওষুধ প্রাপ্ত শিশুদের নিয়ে থট্ এক্সপেরিমেন্টের কথা স্মরণ করতে পারি। আমরা আবার দেখছি, স্বল্পমেয়াদী "সাইকিয়াট্রিক্ উন্নতিকে" দীর্ঘমেয়াদী ব্যক্তিত্বের অবক্ষয়ের সাথে গাঁট ছড়া বেঁধে দেওয়া হল।

(ঘ) সোটেরিয়া ও সাতার সমীক্ষার উপসংহার :

আমরা দেখলাম, এমন কি সাইকিয়াট্রিক্ মাপকাঠির বিচারেও, ওষুধ না পাওয়া রোগীরা ওষুধ-পাওয়া রোগীদের চেয়ে ভাল ফল করল। যদি আমরা সৃজনশীলতা, ক্রীড়োচ্ছলতা, ভালবাসার যোগ্যতা, সংবেদনশীলতা, আধ্যাত্মিকতা, আত্মোপলব্ধি এবং আত্মাতিক্রমণ প্রভৃতির পরিমাপ করতে পারতাম, তাহলে, নিউরোলেপটিক্ ড্রাগ একটা মানুষের যা করে তা জানার পরও, আমাদের কোন সন্দেহই থাকত না যে ওষুধ না-পাওয়া রোগীরাও এসবক্ষেত্রে অনেক ভাল ফল করবে।

আরও একটি অপরিমাপযোগ্য উপকারিতা :

ওষুধ-না-পাওয়া রোগীর ভবিষ্যৎ জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক হল যে এঁদের মস্তিষ্ক ও মনে ওষুধ-প্রয়োগ-জনিত ক্ষতি হয় না, তাঁদের ওষুধ-নির্ভরতা জন্মায় না, যা আবার সময়ের সংগে মস্তিষ্কের ক্ষতি করতে পারে। মনে রাখবেন এই রোগীরা অনেকেই যুবক যাঁদের অবশিষ্ট জীবন পরিসর 40 থেকে 50 বছরের মধ্যে আশা করা যায়।

শখের স্বাস্থ্যকর্মীরা কেন ভাল :

ওষুধ প্রয়োগে বিশ্বাসী চিকিৎসকেরা 30 বছর ধরে হাজারে হাজারে তাঁদের পদ্ধতির উৎকর্ষ সাধন ঘটিয়েছে। সানফ্রানসিস্কো এবং সাতারের কর্মীদের কিন্তু কোন পূর্ব সাইকিয়াট্রিক্ প্রশিক্ষণ ছিল না। কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে কাজ করে তাঁরা প্রতিষ্ঠিত সাইকিয়াট্রিক ফলাফলকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যান। কি করে শখের স্বাস্থ্যকর্মীরা পেশাদার ডাক্তারদের সরাসরি অতিক্রম করতে পারলেন? এর দুটি বোধগম্য কারণ আছে। শখের স্বাস্থ্যকর্মীদের অনেক অনেক ভালবাসা ছিল। পেশাদার ডাক্তাদের ছিল গোষ্ঠীস্বার্থ।

এটা শুধু সূচনা :

সোতেরিয়া এবং সানডিনের সাতার ওয়ার্ডে অলীক ঔষধির প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তে স্কিজোফ্রেনিয়ার সমস্যায় যা দরকার, সেই মানবিক ব্যবহার রোগীরা পেতেন। এই ফলাফলগুলি ছিল শুধুমাত্র সূচনা, সঠিক দিশার ইংগিত। সোতেরিয়া এবং সাতারের থেরাপিষ্টরা যে কোন কারুর থেকে ভাল জানতেন যে উন্নত অবস্থা, অধিকতর জ্ঞান, এবং সমর্থন পেলে তাঁদের রোগীরা অনেক ভাল ফল দেখাতে পারবেন।

ড্রাগ সাইকিয়াট্রির দুঃখজনক ফলাফলের চেয়ে সম্ভবনাই আমাদের মানদন্ড (standard) হওয়া উচিত। প্রত্যেক যুবক স্কিজোফ্রেনিয়ার রোগী তাঁর সমস্যা কাটিয়ে উঠবেন, এটাই নিশ্চিতরূপে লক্ষ্য হওয়া উচিত। আমরা, অন্যান্যরা যেমন ত্রুটিপূর্ণ পথেই জীবন অতিবাহিত করি, তাঁরাও যেন সেইভাবেই জীবনের প্রতিজ্ঞা ও সম্ভবনার পূরণ ঘটান।

নিউরোলেপটিক্ ড্রাগের বর্জন এই লক্ষ্য পূরণে আমাদের যতটা সাহায্য করে, অন্য কিছুই ততটা করে না। এই ওষুধের কারণে মানুষ ও মানুষের সমস্যা সম্বন্ধে যে দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা হয়ে থাকে, তার বর্জন না হলে, সহযোগিতার ক্ষেত্র চিরস্থায়ী হবে না। উপরোক্তটি না হলেও, প্রথমটি কিন্তু সম্ভব। প্রথমোক্তটি আইনের সাহায্যেই করা যায়, অবশ্যই যদি রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকে।

এই নিবন্ধের পরবর্তী অংশে আমরা ইঙ্গিত আইনের পরিবর্তনের প্রসঙ্গে ফিরব। এও বিশ্লেষণ করে দেখব কিভাবে মস্তিষ্কে ওষুধ ক্রিয়াশীল হয়। এইভাবে আমরা আরও ব্যাখ্যা দিয়ে প্রাথমিক তিনটি ধারণার প্রথম ও দ্বিতীয়টির সমর্থন জুগিয়ে যাব।

সূত্র ঃ

1. M. Day and E. R. Semrad, *Schizophrenic reactions*, in *The Harvard Guide to Modern Psychiatry*, Ed. A.M. Nicholi, Harvard University

Press, pp. 199-241, 1978, Cambridge, London.
2. J. P. Left, *Schizophrenia and sensitivity of family environment*, Schizophr Bull, 2, pp. 566-574, 1976.
3. S. M. Matthews, M. T. Roper, L. R. Mosher and A. Z. Menu, *A non-neuroleptic treatment for Schizophrenia : analysis of two-year post discharge risk of relapse*, Shcizophr Bull, 5, pp. 322-333, 1979.
4. R. Sjostram, *Psykoterapi vid schizofreni—en retrospektic studie (Psychotherary in Schizophrenia—a retrospective study)*, Lakartidningen (J. of the Swedish Medical Association) 79, pp. 3183-3186, 1982.

অনুবাদ ঃ ওমপ্রকাশ চক্রবর্তী

ল্যালা-একটি বাতিল ছেলের কথা

বয়স 13/14 বছর। ওর বাবা হারু চক্রবর্তি স্কুলের পড়াশুনা শেষ না করেই গরুর ডাক্তারি শুরু করেছিল। হারুদার বাবা আমাদের নিতাইকাকা, ছোট্ট একটি বাক্স নিয়ে পায়ে হেঁটে বিভিন্ন গ্রামে লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতেন। বৃদ্ধ বয়সে যখন আর অত হাঁটাহাঁটি করতে পারতেন না ছোট্ট একটি দোকানঘর নিয়ে স্টেশনে বসতেন.............. 'পঞ্চাশ বৎসরের অভিজ্ঞ চিকিৎসক' জাতীয় একটি সাইন বোর্ডও ঝুলিয়ে। ফিরে আসা যাক হারু চক্রবর্তির কথায়। এমতাবস্থায় প্রেম করে হারুদা বাড়ির লোকের তীব্র আপত্তি সত্বেও বিয়ে করে ফেললেন আমাদের গ্রামের বীনাদিকে, আমাদের বীনা বৌদি। বিয়ের পর সাংসারিক চাপ। হারুদা বাপের বই-বাক্স এবং দোকান সহযোগে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শুরু করলেন।

বড়ছেলে বলে হারুদা এবং বীনা বৌদিও ল্যালাকে 'মানুষের মত মানুষ' করতে চেয়েছিল আরো অনেক বাবা মায়ের মত। কিন্তু ক্রমশঃই ল্যালার চেহারা চলন-বলন যেন অন্যরকম হয়ে উঠতে লাগল। ডাক্তারবদ্যিও দেখান হল অনেক। পাড়া প্রতিবেশিরা বলে স্টেরয়েড খাইয়ে ল্যালার এই দশা হয়েছে। যাই হোক, ল্যালা ভাল করে কথা বলতে শিখলো না। প্রাইমারি স্কুলের পড়াও ঠিকমত শিখে উঠতে পারলো না। বেঢপ শরীর। সবসময় খাই-খাই করে। যা পায় তাই খায়। তরকারি ছাড়া শুধু ভাতই খেয়ে ফেলে এক হাঁড়ি। ওর জন্য অনেক সময় খাবার লুকিয়ে রাখতে হয়। চা-লস্যি কিছুই বাদ যায় না। কাউকে যদি চোলাই খেতে দেখে তাও ওকে না দিয়ে খাওয়ার উপায় নেই। এখানে ওখানে হেগে ফেলে। ল্যালার একটি ভাই হয়েছে। নাম ট্যাপা। এখন ফাইভে পড়ে। বাবা মা আবার এর দিকে তাকিয়ে আশায় বুক বেঁধেছে—বড় ছেলে তো একরকম 'বাতিল'। ট্যাপা স্কুলে যায়, পড়াশুনো করে। ল্যালার ভাল নাম কি কে জানে। অন্য কোনো নাম ছিল কিনা তাই বা কে জানে!

সংসার চলে নানা পাঁচমিশেলি কারবারে। মানুষের ডাক্তারি, গরুর ডাক্তারি, বাড়িতে হাঁস-গরু-ছাগল পোষা, চালের উপর লাউ পুঁই-কুমড়ো, আগান বাগানের শাকপাতা, বীনা বৌদি আশপাশের গরিব লোকের বাচ্চাদের পড়ায়, লোকের সোয়েটার বোনে। ছোট ছেলেটাকে মানুষ করা—চারজনের সংসার চালাতে তো পয়সা লাগে! পরিশ্রমও লাগে! গরিবের সংসার—কাজের লোক রাখার পয়সা নেই—কাজকর্ম নিজেদেরই হাতে-পিতে করে নিতে হয়। হারুদা গরুর বিচুলিটা মাঝে মাঝে কাটে, ভাল ঘাস পেলে মাঝে মাঝে কেটে নিয়ে আসে। ঘরের কাজকর্ম বৌদিকেই মূলত করতে হয়—যেখানে হারুদা হাত লাগায় না। 'তোমার দাদা তো জলটাও গড়িয়ে খায় না। পারে সব, কিন্তু করবে না। বৌ অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়লে অন্যকথা। তখন রান্না বান্নাও করবে। অন্য সময়ে করলে সমাজে মান থাকে না।' দুঃখ করে বীনা বৌদি সেই সব পুরুষের তালিকা দিলেন— 'এই তো আনন্দ দা উঠান ঝাঁট দেয়।' লোকে আনন্দদের কি চোখে দেখে? কেউ কেউ নাকি বাসনও মাজে। তিন চার বছর হল বীনা বৌদির ডান হাতটা ব্যথা। ডাক্তার 'রেষ্ট' নিতে বলেছে। কি করে রেষ্ট নেবে? সব কাজ নিজেকে করতে হয়। ব্যাথা বেশি হলে একটু তেল মালিশ করলে আরাম লাগে— 'তা তোমার দাদা ওষুধ লাগিয়ে দেয়, মালিশ করতে চায় না। তবু ল্যালা হাতে পিতে কিছু কাজ করে দেয় তাতে একটু বিশ্রাম হয়।'

ছোটবেলা থেকেই বাড়ির গরু-ছাগলের উপর ল্যালার খুব নজর। স্কুলে একসময় ছাগল নিয়ে চলে যেত ; কারণ, পাড়ার দাদু যে আবার দুর্গাপুজার সময় পাঁঠাবলি দেয়, ওকে খেপাত, 'তোদের ছাগল কাইটে খায়ে নেব'। এখানে একটি কথা বলে রাখা যায়—পাড়ার, গ্রামের আমোদের একটি উপকরণ ল্যালা। পাড়ার লোকে ওকে খ্যাপায়, রাগায়, আবার খেতেও দেয়। বিচুলি কাটা, গরুছাগল এখানে ওখানে বাঁধা, লোকের সাথে তাই নিয়ে ঝগড়া করা ল্যালার নিত্যকর্ম। গরু ছাগল লোকের গাছপালা নষ্ট করলে মায়ের চালু উত্তর 'ল্যালা বান্ধছে'। অত্যন্ত মমতার সাথে ল্যালা গরু ছাগল গোয়াল থেকে বের করে, তোলে। বাসন পুকুর ঘাটে নিয়ে যায়, নেবে মাজতে পারে না। জ্যাঠা ঠাকুমার সাথে তার মায়ের নিত্য বিরোধের একটি সেতু ল্যালা। হরি সংকীর্তন, যাত্রার আসরে সে ঠাম্মার নিত্য সঙ্গী। সম্প্রতি ঠাম্মা মারা যাওয়ার একটু মনমরা।

পাড়ার একজন একবার বলেছিলেন, এরা পূণ্যপ্রাণ— গতজন্মের অসম্পূর্ণ কর্ম শেষ করার জন্য পৃথিবীতে এসেছে, কাজ শেষ হলেই নাকি চলে যাবে। কোন এক ধর্মগুরু তাকে এটা বলেছেন। কিন্তু অন্য বাস্তব হয়ত এই যে 'বাতিল' ল্যালা লোকের চোখে মূল্যবান হবেনা—সংসার নিজেকে ব্যস্ত রাখবে 'সুস্থ' ট্যাপাদের মানুষের মত মানুষ করার জন্য—সেই মানুষের মতন মানুষের সমাজ সংসারের একপাশে ল্যালাদের ফেলে রাখবে। আর তাদের চিকিৎসা পূবর্বাসনের জন্য প্রতিষ্ঠান বানাবে। পুণর্বাসন দিতে না পেরে ল্যাজে গোবরে হবে। যুক্তির পরম্পরা কেমন রহস্যময় মনে হয়।

পরিক্রমা

নাগা মুক্তি আন্দোলন কি নতুন পথে?

পঞ্চাশ দশকের গোড়া থেকে ভারতীয় ফৌজ-এর হাতে নাগাভূমির রক্তস্নান শুরু হয়। সাথে সাথেই নাগাদের সশস্ত্র প্রতিরোধও গড়ে ওঠে। তার আগে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনকালে কংগ্রেসের তরফ থেকে দেওয়া গণভোটের প্রতিশ্রুতি (বৃটিশরা চলে যাবার পর) কংগ্রেস পরিচালিত ভারত সরকার ভংগ করায় নাগারা নিজেরাই তার আয়োজন করে। এই গণভোটে বিপুল সংখ্যাধিক্যে নাগারা ভারত রাষ্ট্র থেকে স্বতন্ত্র স্বাধীন নাগা রাষ্ট্রের স্বপক্ষে মত ব্যক্ত করে। এক অন্তর্বর্তীকালীন নাগা সরকার তৈরী করে নাগাভূমিকে স্বাধীন নাগারাষ্ট্র ঘোষিত হয়।

অচিরেই শুরু হয় বিপুল সংখ্যায় ভারতীয় ফৌজের অবতরণ এবং নাগা অধিবাসীদের বিরুদ্ধে এক অঘোষিত পূর্ণমাত্রায় যুদ্ধ। ভারত সরকার থেকে শুরু করে ডান বাম সব রঙ নির্বিশেষে দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দল ও সংবাদপত্রের মধ্যে এ ব্যাপারে এক নাগা-বিরোধী "জাতীয় ঐক্যমত" তৈরী হয়। ভারতীয় ফৌজী সেনাপতিদের শর্ত মেনে নিয়ে নাগা "বিদ্রোহী"-দের খোলা হাতে দমনের অবাধ অধিকার সেনাদের দেওয়া হয় এবং ভারতীয় সরকার ও বেসরকারী সংবাদ মাধ্যমগুলি এ ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকে। ফলে আশি-র দশকের আগে পর্যন্ত নাগাভূমি কার্যত এক ফৌজী লৌহ যবনিকার আড়ালে চলে যায়। ফৌজী সেনাপতিরা নাকি আশ্বাস দিয়েছিল যে তাদের শর্ত মেনে নিলে তারা দু-বছরের মধ্যে নানাভূমিকে "শান্ত" (pacify) করে দেবে। শর্ত মেনে নেবার পর দু-বছরের জায়গায় আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর হতে চললো নাগাভূমির রক্তক্ষরণ অব্যাহত আছে। নাগাদের "শান্ত" করা যায়নি।

অতি সম্প্রতি নাগা জনসাধারণ নিজেরাই এই রক্তঝরা পর্বের ছেদ টেনে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে তাঁদের প্রথম পদক্ষেপটি নিয়েছেন। নিচে উদ্ধৃত খবরটি সেই সম্পর্কেই। কিন্তু এই উদ্দেশ্য কতদূর সফল হবে তা এখনই বলা মুশকিল ; কারণ ঐ খবর অনুয়ায়ীই ভারতীয় ফৌজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধে যুক্ত একাধিক নাগা সংস্থা এখনও এই উদ্যোগে যোগ দেয় নি। অন্যদিকে ইতিমধ্যেই ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে নাগাদের এই শান্তি কামনার মনগড়া অপব্যাখ্যা শুরু হয়েছে। যেমন, এক বৃহৎ, সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে এই প্রসঙ্গে অন্য অনেক নির্দোষ ও প্রাজ্ঞ মন্তব্যের সাথে এই মন্তব্যও করা হয়েছে যে, "জঙ্গী নাগা নেতৃত্বের প্রধান অংশটি অন্তত ভারতীয় জাতীয়তার সহিত নাগা খন্ড জাতীয়তাকে মিলাইতে উদ্যোগী।" (আনন্দবাজার—2001)। এই মন্তব্যের কোন সমর্থন নীচে উদ্ধৃত সংশ্লিষ্ট খবরে নেই। উল্টে নাগারা এখানে বলেছেন—"এক সম্মানজনক শর্তে বোঝাপড়া ও আমাদের ইতিহাসের যথাযথ স্বীকৃতি ছাড়া আমরা নাগাজনগণ আমাদের সংগ্রাম পরিত্যাগ করতে পারিনা।" অর্থাৎ তাঁরা কেবলমাত্র অস্ত্রত্যাগ করার কথা বলেছেন ;তাঁদের স্বকীয় স্বতন্ত্র জাতীয় সত্বা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম গুটিয়ে নিয়ে "ভারতীয় জাতীয়তা"-র সাথে "মিলাইতে উদ্যোগী" হননি। এধরণের অপব্যাখ্যা নাগাভূমিতে রক্তক্ষয় বন্ধের পরিপন্থী। ভারতভূমির অধিবাসী ও অন্যতম এক বড়জাতির (অর্থাৎ বাঙালী) সদস্য হিসেবে আমরা এ ধরণের অপব্যাখ্যার সাথে দ্বিমত প্রকাশ করি। মনে রাখা ভাল পঞ্চাশদশকের শেষভাগ থেকে সত্তর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত মার্কিন সরকার ও তার নানা পুতুল সরকার ভিয়েতনামীদের মুক্তিযুদ্ধ দমনের জন্য যত ধরণের বর্বরতা চালায় তার প্রায় সবই নাগাভূমিতে প্রযুক্ত হয় ; শুধু তার তীব্রতার মাত্রা আরও অনেক বেশী। যাট ও সত্তরদশকে বৃটিশ 'প্রতিঅভ্যুত্থান বিশেষজ্ঞ'-দের (Counter insurgency experts) একটা মত এই ছিল যে সাফল্যের জন্য দমনকারী ফৌজের সংখ্যা বিদ্রোহীদের তুলনায় কমপক্ষে দশ থেকে পনের গুণ হওয়া দরকার। ভিয়েতনামে মার্কিনী হানাদাররা এই অনুপাত তিন বা চারের বেশী ওঠাতে পারেনি। কিন্তু নাগাভূমির ক্ষুদ্র জনসংখ্যার তুলনায় ভারতীয় ফৌজের স্ফীতকায় আকারে ফলে সংগ্রামরত বিদ্রোহীদের তুলনায় এই অনুপাত কুড়ি বা তিরিশগুণ বা তাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

অন্য দিকে সত্তর দশকের পরে ভারতীয় ফৌজ রক্তক্ষরণে আর এক নতুন বিভীষিকামায় মাত্রা যোগ করতে সমর্থ হয়। এক আদর্শ ঔপনিবেশিক কায়দায় তারা সংগ্রামরত নাগাদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে হিংসাশ্রয়ী অন্তর্কলহের জন্ম দিতে সক্ষম হয়। অবশ্যই এ ব্যাপারে নাগারা তাদের নিজেদের অদূরদর্শি মূঢ়তার ও কিছু পরম্পরাগত পারস্পারিক বৈরীতার দায় অস্বীকার করতে পারেন না। এই ভয়াবহ ভ্রাতৃঘাতী রক্তক্ষরণ থেকে অবশেষে বেরিয়ে আসার গভীর আকুতিও নীচে উদ্ধৃত খবরে পাওয়া যাবে। আমরা সর্বান্তঃকরণে কামনা করি নাগা জনসাধারণের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ফিরে আসুক।

নাগারা এই সম্মেলনে পুরোনো ক্ষত-র নিরাময়ের জন্য পারস্পরিক "ক্ষমার" কথা বলেছেন। ভারতবাসীর নামে ভারতীয় ফৌজ নাগা জনসাধারণের উপর যে হিংস্রতাণ্ডব চালিয়েছে, অ-নাগা ভারতবাসী হিসেবে আমরা নাগাদের কাছে সে জন্য নতজানু হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করি। এটা কোন নজীরহীন ঘটনা

নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে জাপ অধিকৃত অঞ্চলে জাপফৌজের বর্বর আচরণের জন্য জাপান সরকার সাম্প্রতিককালে জাপ জনসাধারণের হয়ে ভুক্ত ভোগী চীনা ও কোরীয় জনগণের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আর একটা কম পরিচিত তথ্য উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। খ্রীশ্চান দুনিয়ার ভেতরে প্রাতিষ্ঠানিক নেতৃত্বের বিরুদ্ধে দুনিয়া জোড়া প্রতিষ্ঠান বিরোধী পরম্পরাগুলির আন্দোলন ষাটের দশক থেকে এত তীব্র হয় যে তা লাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকাতে তো বটেই, ভারতের কেরালা ও অন্যদিকে নাগাভূমির জন আন্দোলনের ওপরও গভীর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। নীচের খবরে বারে বারে গীর্জার উল্লেখ থেকে বোঝা যায় খ্রীশ্চান ধর্মাবলম্বীরা সেখানে একটা বড় শক্তি। অন্যান্য সংগঠিত ধর্মের অনুগামীদের মধ্য থেকে (হিন্দু, মুসলমান, ইহুদী ইত্যাদি) এমন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বিরোধী ধারা যদি আত্মপ্রকাশ করত তবে সমস্ত ধরণের স্বাধিকার আন্দোলন তাতে আরও শক্তি পেত। দুর্ভাগ্যক্রমে এখনও পর্যন্ত তার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। সংবাদপত্র থেকে উদ্ধৃতি [Times of India, 22.12.2001] ঃ

বিভিন্ন নাগা গোষ্ঠীর মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও পারস্পরিক সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় গত শুক্রবার (Dec. 21, 2001) 'নাগা-হো হো' (সমস্ত নাগা গোষ্ঠীদের এক পরম্পরাগত সম্মিলিত শীর্ষস্থানীয় সংস্থা) এক বিপুল অভিযান শুরু করে। রঙীন পোষাকে সেজেগুজে হাজার হাজার নাগা আদিবাসীরা এই অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। অন্যতম দুই প্রধান নাগা সংগঠন NSCN (খাপলাং) এবং নাগা ন্যাশনাল কাউন্সিল এই জমায়েতে অনুপস্থিত থাকলেও অন্য আর এক সংগঠন NSCN(I-M) যথেষ্ট সংখ্যায় উপস্থিত ছিল।

নাগাদের জাতীয় সম্প্রীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠা অভিযানের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এক ঘোষণা গৃহীত হয়। 1826 সালে তাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে সাক্ষরিত য়ানদাবো চুক্তি (Treaty of Yandabo) থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত নাগাদের সংগ্রামের বিস্তৃত বিবরণ এই ঘোষণাতে উপস্থিত করা হয়। সাথে সাথেই নাগাদের আত্মগোপনকারী 'জাতীয় কর্ম্মীদের' বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে চলমান আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও লড়াই-এর ব্যাপারেও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। ঘোষণাতে বলা হয় যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনার এই প্রক্রিয়া "স্থায়ী শান্তি, উন্নয়ন, বিকাশ ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়োজিত এক জটিল ও এক অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া।"

ঘোষণা অনুযায়ী "এক সম্মানজনক শর্তে বোঝাপড়া ও আমাদের ইতিহাসের যথাযথ স্বীকৃতিছাড়া আমরা নাগা জনসাধারণ আমাদের সংগ্রাম পরিত্যাগ করতে পারিনা। আমরা এ'ও জানি যে বিভাজন, তিক্ততা ও সশস্ত্র মোকাবিলার মাধ্যমে নাগা রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হবেনা।"

'নাগা-হো হো', গীর্জা ও সামাজিক সংগঠনগুলি এধরণের একটি প্রক্রিয়া শুরু করার জরুরী তাগিদ অনুভব করছে, যেখানে অতীতের অন্যায় ও ভুলগুলো স্বীকার করে নেওয়া হবে ও ভবিষ্যাতের স্বার্থে অতীতের বেদনার প্রতিবিধান করা হবে। যাঁরাই কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করেছেন, তাঁদের সবার কাছেই এই ডাক পাঠান হয়েছে যে "তাঁরা যেন ক্ষমা করেন ও আমাদের এই যাত্রার সাথে পা মেলাতে এগিয়ে আসেন।"

অনেকেরই আশংকা ছিল যে NSCN (I-M)-ও এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেনা। কিন্তু এরাই একমাত্র আত্মগোপনকারী সংস্থা যারা অংশগ্রহণ করেছিল এবং খুব বড় মাপেই করেছিল। NSCN (I-M)-এর সহ সভাপতি খোদাও য়ানথান্ এবং ওই সংস্থারই যুদ্ধ বিরতি তদারকবারী শাখার আহবায়ক কর্ণেল ফুংথিং সিমারা সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিমারা বলেন যে বিভিন্ন নাগা গোষ্ঠী ও সংগঠনের মধ্যে জাতীয় স্তরে সম্প্রীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠা-র এই প্রক্রিয়াকে তাঁরা স্বাগত জানাচ্ছেন। কিন্তু তাঁরা চান যে নাগা জাতীয় নীতির সাথে তার যেন সামঞ্জস্য থাকে। তিনি আরও যোগ করেন যে নাগা রাজনৈতিক সমস্যা যেন সব সময়েই খেয়ালে থাকে।

'নাগা-হো হো' সভাপতি এম. ভারো বলেন যে পরস্পরকে আক্রমণের লক্ষ্য বানিয়ে তারা কিছুই অর্জন করতে পারবে না বা নাগা রাজনৈতিক সমস্যারও সমাধান করতে পারবেনা। এসবের সাথে জড়িত সবার কাছেই তিনি এধরণের কার্যকলাপে বিরতি টানার ও আর নতুন কোন প্ররোচনামূলক পদক্ষেপ না নেওয়ার আবেদন রাখেন।

পরে সংবাদ মাধ্যমগুলিকে তিনি জানান যে NSCN (খাপালাং) ও NNC-র অনুপস্থিতি তাঁদের নিরুৎসাহিত করবে না। কারণ এক সুদীর্ঘ প্রক্রিয়ার এ কেবল সূচনা মাত্র। এই প্রক্রিয়াতে বহুমাস বা এমনকি পুরো একবছরও লেগে যেতে পারে। কিন্তু আসাম-ই হোক বা মণিপুর, অরুণাচল প্রদেশ বা মায়ানমার, সমস্ত জায়গার আদিবাসী গোষ্ঠীদের কাছ থেকে অত্যন্ত ইতিবাচক সাড়া মিলেছে।

'নাগা-হো হো' ও গীর্জাসমূহের সংযোগকারী সংস্থার আহ্বায়ক ইরালু-নিকাতু জানান যে NNC নেতৃত্বের তরফ থেকে প্রতিনিধিত্ব না থাকলেও তাঁদের কাছ থেকে বার্তা এসেছে এবং নিকট ভবিষ্যতে অন্যান্য নানা গোষ্ঠীর সাথেও আরও আলোচনার আশা করছেন তাঁরা।

অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণের মধ্যে ছিল নাগা সমাজের সমস্ত অংশের মানুষের ভাষণ ও গান বাজনা। নাগা আত্মগোপনকারী সংস্থা, আভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের যাঁরা শিকার, এমন কি শিশুরাও এতে অংশগ্রহণ করেন। স্বাক্ষরিত বহু কাগজের টুক্‌রো আনুষ্ঠানিক ভাবে পুড়িয়ে সমস্ত বিদ্বেষের অবসান ঘোষণা করা হয়।

— যোগীন, সুভাষ

Best Complements :

M/s CONSULTANTS CONSORTIUM

625A, Diamond Harbour Road,
Behala, Kolkata 700 034

Project Taxation & Management Consultants

Phone No. : 458 5691 457 0694

সুখময় ভট্টাচার্য স্মরণে

শ্রী সুখময় ভট্টাচার্য আর নেই। গত 28 এপ্রিল (2001) তারিখে কলকাতার তাঁর প্রয়াণ ঘটেছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়েস হয়েছিল 60 বছর।

সুখময় দা'র পেশাগত শিক্ষা ছিল চিকিৎসাবিদ্যায়। জীবিকা'র ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন মূলতঃ গবেষক/শিক্ষক। কলেরা রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট-এ গবেষক থাকা কালে ঐ ইন্‌স্টিটিউটের কর্তৃপক্ষের পৃষ্ঠাপোষকতায় পরিচালিত এক অমানবিক ও বে-আইনী কর্মসূচির বিরুদ্ধে (এক নতুন প্রস্তাবিত রোগ প্রতিষেধক টিকার কার্যকারীতা পরীক্ষার জন্য একাংশের গরীব মানুষকে না জানিয়ে তাঁদের উপর ঐ টিকা প্রয়োগ করা হচ্ছিল।) প্রতিবাদ আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে তিনি (ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী চিকিৎসাবিদ জ্ঞানব্রত শীল) কর্মচ্যুত হন। পরে তাঁরা পি. জি. বেসিক মেডিসিন -এ শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন।

এই দুই বন্ধুর উদ্যোগে 'নর্মান বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলন" নামে এক এক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সংস্থার তরফ থেকে জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত নানা বিষয়ের উপর অ-বিশেষজ্ঞ মানুষদের লক্ষ্য করে বহু ছোট ছোট পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। এঁরা উত্তর কলকাতায় বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসাসংক্রান্ত পরামর্শ দানের জন্য একটি কেন্দ্র কিছুদিন চালান, যেখানে চিকিৎসকদের অনৈতিক পেশাগত কার্যপলাপের ফলে ভুক্তভোগীদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হত। বীরভূম জেলার লাভপুরে মানসিক রোগাক্রান্তদের জন্য এক চিকিৎসাকেন্দ্রও তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সাধারণভাবে আশী ও নব্বই-র দশকে পশ্চিমবঙ্গে গণবিজ্ঞান আন্দোলনে'র যে একটা প্রবাহ চলেছিল তিনি তাঁর সাথে যুক্ত ছিলেন। ঢাকার গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ ছিল এবং 'মাসিক গণস্বাস্থ্য' পত্রিকার নিয়মিত লেখকও ছিলেন তিনি।

সুখময়দা বি-ও-বি'র খুবই কাছের মানুষ ছিলেন। বলা বাহুল্য যে তার মানে এ নয় যে সব কিছুতেই তাঁর সাথে মনের মিল হত। অনেক কিছুই নিয়েই অনেক সময়ে তর্কবিতর্কও হত। উঁচু পাওয়ারের ঝকঝকে কাঁচের পিছনে তাঁর বড় বড় দুই চোখ কৌতুক ও হাসিতে যখন তখন ঝিকমিক করে উঠত। উষ্ণতা, অনবদ্য সরস বাচনভঙ্গী, পরিহাসপ্রিয়তা, সব কিছু মিলেই তিনি ছিলেন আমাদের অনেকের কাছেই এক প্রিয় ব্যক্তিত্ব।

দুর্ভাগ্যক্রমে মৃত্যুর বেশ কয়েক বছর আগে সেই উজ্জ্বল চোখ তার দৃষ্টি শক্তি হারায়। কাজেই আগের মত আর অবাধ যাতায়াত তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না, আমাদের সাথে যোগাযোগ কার্যত আর ছিল না। ব্যক্তিগত জীবনেও দুর্যোগের শীকার হন তিনি।

তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর সাথে পরিচিত মানুষরা কলকাতার স্টুডেন্টস্ হলে এক স্মরণ সভার মিলিত হন।

আমরা গভীর প্রীতি শ্রদ্ধা ও বেদনা'র সাথে আমাদের এই প্রয়াত বন্ধুকে স্মরণ করছি।

সত্যকে মনে করে

গত 9 জুলাই 2001, মাত্র চুয়াল্লিশ বছর বয়সে সত্য (সত্যব্রত কর) আমাদের ছেড়ে গেছে। ঘটনার আকস্মিকতায় আমরা অনেকেই বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম, সত্যহীনতা আমাদের অনেকের কাছে শুরুতে দুঃসহ মনে হয়েছিল। সত্য'র ভালবাসার জগৎ বিওবি'র বাইরেও বহুদূর প্রসারিত ছিল। তার বন্ধুরা একটি স্মরণসভার আয়োজন করে এবং নীচের আমন্ত্রণপত্রটি মারফৎ তা সত্য অনুরাগীদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করে।

ঐ স্মরণসভায় নানা বয়সের নারী পুরুষ প্রায় আড়াইশো জন উপস্থিত হন। প্রায় ছ'ঘন্টা ধরে স্মৃতিচারণে-গানে কবিতায়-ছবিতে-পোষ্টারে হাসি কান্নায় সত্য উদ্বেল হয় শেষবারের মত। কিংবা হয়তো সেটাই শেষ নয়।

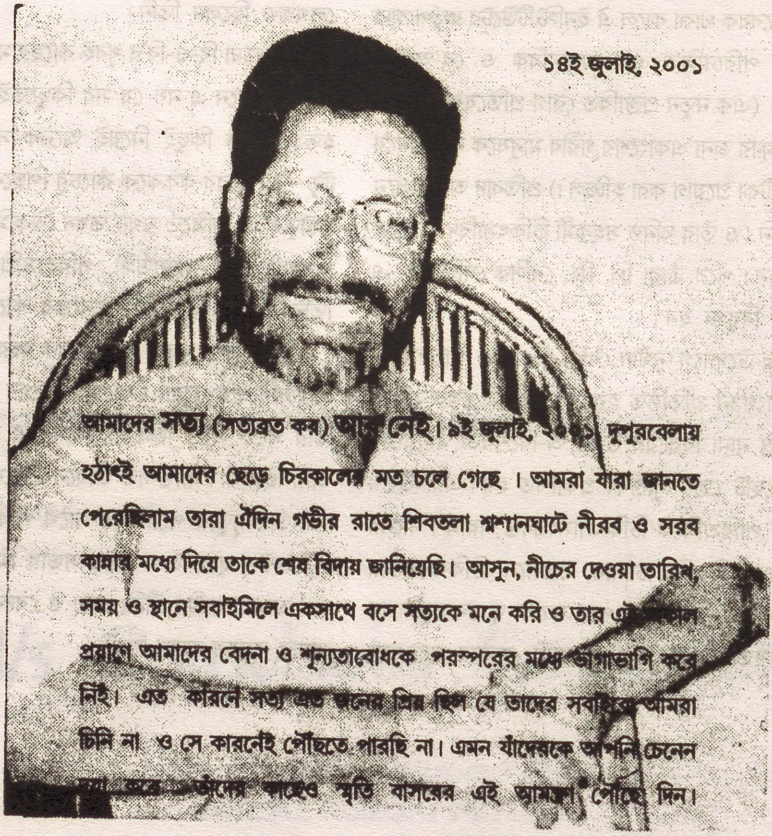

সত্যর বন্ধু ও পরিবারের পক্ষে —
তন্ময় রাজা রাম কাজল শিবু যোগিন নিলয় অমিতা ও আরো অনেকে

স্মৃতিবাসর : ২১ শে জুলাই, ২০০১ শনিবার দুপুর ২ টো,
ভার্মা ফ্ল্যাট কমিউনিটি হলে (উত্তরপাড়া ষ্টেশন থেকে হাঁটাপথে ৩মিঃ)

যোগাযোগ :
৩বি/১০৪, ডি. জি. এম সরণী, পোঃ ভদ্রকালী, জেলাঃ হুগলী পিন : ৭১২২৩২, ফোন : ৬৯৪২২২২

VIJNAN O VIJNANKARMI Rn. No. 34929/79 Rs. 15.00

Vol. XXIII Nos. 1-4 JANUARY–DECEMBER 2001

গ্রাহক ও পাঠকের প্রতি : গ্রাহকপদ রিনিউ করুন, গ্রাহক হোন। চিঠিপত্র, মতামত ও রচনাদি পাঠান। যোগাযোগের জন্য বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় (সাড়ে ছটা-সাতটা) 2/1A আশুতোষ শীল লেনে (সুকিয়া স্ট্রীট থেকে, কলিকাতা 700 009) আসুন। বা ডাকযোগে (লেকটাউন) চিঠি পাঠান।

বইমেলা-2002

আমরা থাকছি আপনারাও আসুন

বইমেলায় আমাদের লিটল ম্যাগ স্টলে আরও পাবেন

নিউক্লিয়ার বোমা নয় —35 টাকা

রাষ্ট্রসংঘের মানবিক অধিকারের বিশ্বজনীন ঘোষণা—5 টাকা

পরিবেশ দূষণ পরিচিতি ও পরিমাপ—রবীন মজুমদার—30 টাকা

পড়ুন ও পড়ান : **কালধ্বনি**—একটি সমাজ অর্থনীতি ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা। বইমেলায় সংগ্রহ করুন।

প্রকাশিত হল : দিশাহীন এক অনুসন্ধানী প্রকাশনা—**সমতল**

যোগাযোগ—14C DPP রোড, রামগড়, কলকাতা-47

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী, প্রযত্নে : অভিজিৎ লাহিড়ী, পি 252, লেক টাউন, ব্লক A, কলকাতা 700 089

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে রবীন মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ইটারনিটি প্রেসের পক্ষে প্রিন্টিং পাবলিসিটি, 117, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা 700 009 থেকে মুদ্রিত।